ভূমিকা।

কোন ভাষার সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনার আদর্শ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত করিয়া ছাত্রগণের সম্মুখে ধারণ করিলে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন লেখকের অবলম্বিত ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর রচনার প্রকৃতি জানিয়া সাহিত্য শিক্ষার সুবিধা পাইয়া থাকে। এ নিমিত্ত চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, তখন নানা কারণে পুস্তকখানিকে ঠিক সেইরূপ করিতে পারি নাই। আজ চব্বিশ বৎসর পরে এই পুস্তকখানি নূতন ভাবে সম্পাদন করিয়া, নূতন আকারে প্রকাশিত করা হইল।

এই পুস্তকে বহু লেখকের রচনা অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ না করিয়া, কয়েক জন প্রধান লেখকের রচনা বেশী বেশী করিয়া সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে ছাত্রদিগের পক্ষে লেখকগণের রচনাভঙ্গীর বৈচিত্র্য বুঝিবার অধিক সুবিধা হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্বরচিত কয়েকটি প্রবন্ধও, অতিশয় সঙ্কোচ ও ভয়ের সহিত, এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

ছাত্র শিক্ষার উপযোগী করিবার জন্য প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, তাহাতে প্রবন্ধের গৌরব বা সৌন্দর্য্যের কোন রূপ হানি ঘটে নাই।

যে সকল গ্রন্থকার স্বীয় স্বীয় গ্রন্থাবলী হইতে আমাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ আছি।

পঞ্চসার, ঢাকা।
১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৩৮ শক।

শ্রীপরেশনাথ মহলানবীশ।

সূচীপত্র।

গদ্যভাগ।

পদ্যভাগ।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

প্রথম খণ্ড।

একটি পক্ষীর আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন।

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যে স্থানে দুর্ব্বৃত্ত দশানন-প্রেরিত নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক জানকীর নিকট হইতে রামচন্দ্রকে হরণ

করিয়াছিল, যে স্থানে মৈথিলীবিয়োগবিধুর রাম ও লক্ষ্মণ সাশ্রু-নয়নে ও গদগদবচনে নানাপ্রকার বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া তত্রস্থ পশুপক্ষীদিগকে দুঃখিত ও পরিতাপিত করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম অবস্থিত ছিল। ঐ আশ্রমের অনতি-দূরে পম্পানামক সরোবরের পশ্চিম তীরে ভগবান্ রামচন্দ্র শর দ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে; বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে বোধ হয় যেন আলবাল রহিয়াছে। উহার শাখা-প্রশাখা সকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধ হয় যেন, হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিতেছে। স্কন্ধদেশে এরূপ উচ্চ বোধ হয় যেন, একেবারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিবার আশয়ে মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর কোটরে শাখাগ্রে, স্কন্ধদেশ ও বল্কলবিবরে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া শুক-শারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ সুখে বাস করে। তরু অতিশয় প্রাচীন; সুতরাং বিরলপল্লব হইয়াও পক্ষি-শাবকদিগের দিবানিশি অবস্থিতি প্রযুক্ত সর্ব্বদা নিবিড়পল্লবাকীর্ণ বোধ হয়। কোন কোন পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীরা রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়; প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন, হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা দিগ্‌দিগন্তে গমন করিয়া আহারদ্রব্য অন্বেষণ পূর্ব্বক

আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে করিয়া খাদ্যসামগ্রী আনে ও যত্ন পূর্ব্বক আহার করাইয়া দেয়।

সেই মহীরুহের এক জীর্ণ কোটরে আমার মাতাপিতা বাস করিতেন। মাতা আমাকে প্রসব করিয়া সূতিকা পীড়ায় অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার প্রিয়তমা জায়ার বিয়োগ-শোকে অতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখিত চিত্ত হইলেন, তথাপি স্নেহবশতঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না, তথাপি আস্তে আস্তে সেই আবাসতলে নামিয়া পক্ষি-কুলায়-ভ্রষ্ট যে যৎকিঞ্চিৎ আহার-দ্রব্য পাইতেন, আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহা থাকিত, আপনি ভোজন করিয়া যথাকথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেন।

একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত। পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময়। নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিত-বর্ণ। গগনাঙ্গবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহন-মানসে মানস-সরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ভয়াবহ মৃগয়াকোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহ সকল গভীর-স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল; কোন প্রদেশে

তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশু সকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কোন স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তু সকল ছুটাছুটি করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, সিংহের গর্জ্জনে, ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি সেই কোলাহল শ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া পিতার জীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে ব্যাধদিগের 'ঐ বরাহ যাইতেছে, ঐ হরিণ দৌড়িতেছে, ঐ করভ পলাইতেছে' ইত্যাদি নানাপ্রকার কোলাহল শুনিতে পাইলাম।

মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ ও কদাকার শবর-সৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তকের স্মরণ হয়। সেনাপতির নাম মাতঙ্গক—পশ্চাৎ অবগত হইলাম। সুরাপানে দুই চক্ষু জবাবর্ণ, সর্ব্বশরীরে বিন্দু বিন্দু রক্তকণিকা লাগিয়াছে; সঙ্গে কতকগুলি বড় বড়

শিকারী কুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন বিকটাকার অসুর বন্য পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে। শবর-সৈন্য অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, ইহারা কি দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মান্বিত! জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য-মাংস আহার, ধনু, ধন, কুকুর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, অধর্ম্মের ভয় নাই ও সদাচারে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় মৃগয়াজন্য শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের আবাস-তরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে জল ও মৃণাল আনিয়া, পিপাসা ও ক্ষুধাশান্তি করিল। শ্রান্তি দূর করিয়া চলিয়া গেল।

শবর-সৈন্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ সে দিন কিছুই শিকার করিতে পারে নাই ও মাংস প্রভৃতি কিছুই পায় নাই; সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলে দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, রক্তবর্ণ দুই চক্ষু দ্বারা সেই তরুর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একবার নিরীক্ষণ করিল। তাহার নেত্রপাত—মাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষি-শাবকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, নৃশংসের অসাধ্য কি আছে? সোপানশ্রেণীতে পাদক্ষেপ পূর্ব্বক অট্টালিকায় যেরূপ অনায়াসে উঠা যায়, নৃশংস কণ্টকাকীর্ণ দুরারোহ

সেই প্রকাণ্ড মহীরুহে সেইরূপ অবলীলাক্রমে আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষি-শাবকদিগকে ধরিয়া একে একে বহির্গত করিয়া প্রাণসংহার পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিতার একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে কস্ম ৎ এই বিষম সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে নিতান্ত ভীত হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কাঁপিতে লাগিল এবং তালুদেশ শুষ্ক হইয়া গেল; ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় না দেখিয়া আমাকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিলেন ও আপন বক্ষঃস্থলের নিম্নে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন পক্ষপুটে আচ্ছাদন করেন, তখন দেখিলাম, তাঁহার নয়নযুগল হইতে জলধারা পড়িতেছে। নৃশংস ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কুলায়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া কাল-সর্পাকার বামকর কোটরে প্রবে করিয়া পিতাকে ধরিল; তিনি চঞ্চুপুট দ্বারা যথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন, কিছুতেই ছাড়িল না; কোটর হইতে বহির্গত করিল, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিল, পরিশেষে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিল। পিতার পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত ও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম বলিয়া আমাকে দেখিতে পাইল না। ঐ তরুতলে শুষ্ক পর্ণরাশি একত্র ছিল; তাহারই উপর পতিত হইলাম, অধিক আঘাত লাগিল না।

অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না; কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে। শৈশব-প্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে স্নেহসঞ্চার না হওয়াতে কেবল ভয়েরই পরতন্ত্র হইলাম। প্রাণপরিত্যাগের উপযুক্তকালেও নিতান্ত নৃশংস ও

নির্দ্দয়ের ন্যায় উপরত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অস্থির-চরণ ও অসমগ্রোদিত পক্ষপুটের সাহায্যে আস্তে আস্তে গমন করিবার উদ্‌যোগ করাতে বারংবার ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলাম;—ভাবিলাম, বুঝি, এ যাত্রায় কৃতান্তের করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ হইল। পরিশেষে মন্দ মন্দ গমন করিয়া নিকটস্থিত এক তমালতরুর মূলদেশে লুকাইলাম। এমন সময়ে সেই নৃশংস চণ্ডাল শাল্মলীবৃক্ষ হইতে নামিয়া পক্ষিশাবকদিগকে একত্র ও লতাপাশে বদ্ধ করিল, এবং যে পথে শবর-সৈন্যেরা গিয়াছিল, সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল।

দূর হইতে পতিত ও ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে আমার কলেবর কম্পিত হইতেছিল; আবার বলবতী পিপাসা কণ্ঠশোষ করিল। এতক্ষণে পিশাচ অনেক দূর গিয়া থাকিবে, এই সম্ভাবনা করিয়া মুখ বাড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলাম। কোন দিকে কোন শব্দ শুনিবামাত্র অমনি শঙ্কিত হইয়া পদে পদে বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া তমালমূল হইতে নির্গত হইলাম ও আস্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কখন বা পার্শ্বে কখন বা সম্মুখে পতিত হওয়াতে শরীর ধূলিধূসরিত হইল ও ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, "কি আশ্চর্য্য! যত দুর্দ্দশা ও যত কষ্ট সহ্য করিতে হউক না কেন, তথাপি কেহ জীবন-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমার সমক্ষে পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বচক্ষে দেখিলাম, আমিও বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায়

হইয়াছি ; তথাপি বাঁচিবার বিলক্ষণ বাসনা আছে। হায়! আমার তুল্য নির্দ্দয় আর কে আছে? মাতা প্রসবসময়ে প্রাণত্যাগ করিলে পিতা জায়াশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াও কেবল আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন-পালন করিতেছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ-প্রযুক্ত বৃদ্ধবয়সেও তাদৃশ বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়া আমারই রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি সে সকল একবারে বিস্মৃত হইলাম। আমার পর কৃতঘ্ন আর নাই; আমার মত নৃশংস ও দুরাচার এই ভূমণ্ডলে কাহাকেও দেখিতে পাই না। কি আশ্চর্য্য! সেরূপ অবস্থাতেও আমার জলপান করিবার অভিলাষ হইল। দূর হইতে সারস ও কলহংসের অনতি-পরিস্ফুট কলরব শুনিয়া অনুমান করিলাম, সরোবর দূরে আছে। কিরূপে সরোবরে যাইব, কিরূপে জলপান করিয়া প্রাণ বাঁচাইব, অনবরত এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে দিনমণি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড অংশুসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইল। পথে পাদক্ষেপ করা কাহার সাধ্য! সেই উত্তপ্ত বালুকায় আমার পা দগ্ধ হইতে লাগিল। কোন প্রকারে মরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে সময়ে এরূপ কষ্ট ও যাতনা উপস্থিত হইল যে, বিধাতার নিকট বারংবার মরণের প্রার্থনা করিতে হইল। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক ও অঙ্গ অবশ হইল।

সেই স্থানের অনতিদূরে জাবালি নামে পরম পবিত্র মহাতপা

মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র হারীত কতিপয় বয়স্য সমভিব্যাহারে সেই দিক্ দিয়া সরোবরে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তিনি এরূপ তেজস্বী যে, হঠাৎ দেখিলে সাক্ষাৎ সূর্য্যদেবের ন্যায় বোধ হয়। তাঁহার মস্তকে জটাভার, ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, কর্ণে স্ফটিকমালা, বাম করে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে আষাঢ়দণ্ড, স্কন্ধে কৃষ্ণাজিন ও গলদেশে যজ্ঞোপবীত। তাঁহার প্রশান্ত আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হইল যেন, পরম কারুণিক ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি আমার রক্ষার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। সাধুদিগের চিত্ত স্বভাবতঃই দয়ার্দ্র। আমার সেইরূপ দুর্দ্দশা ও যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইল এবং আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বয়স্যদিগকে কহিলেন, "দেখ দেখ, একটি শুক-শিশু পথে পতিত রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শাল্মলীতরুর শিখরদেশ হইতে পতিত হইয়া থাকিবে; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে ও বারংবার চঞ্চুপুট ব্যাদান করিতেছে। বোধ হয়, অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া থাকিবে, জল না পাইলে আর অধিকক্ষণ বাঁচিবে না। চল, আমরা ইহাকে সরোবরে লইয়া যাই। জলপান করাইয়া দিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।" এই বলিয়া আমাকে ভূতল হইতে তুলিলেন। তাঁহার করস্পর্শে আমার উত্তপ্ত গাত্র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। অনন্তর সরোবরে লইয়া গিয়া আমার মুখে উন্নত চঞ্চুপুট বিস্তৃত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দু বিন্দু বারিপ্রদান করিলেন। জল পান করিয়া পিপাসা-শান্তি হইল। পরে আমাকে স্নান করাইয়া নলিনীপত্রের শীতল ছায়ায় বসাইয়া

রাখিলেন। অনন্তর ঋষিকুমারেরা স্নানান্তে অর্ঘ্যপ্রদান পূর্ব্বক ভগবান্ ভাস্করকে প্রণাম করিলেন এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ ও পবিত্র নূতন বসন পরিধান পূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিয়া তপোবনাভিমুখে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন।

তপোবন সন্নিহিত হইলে দেখিলাম, তত্রস্থ তরু ও লতাসকল কুসুমিত, পল্লবিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এলা ও লবঙ্গলতার কুসুমগন্ধে দিক্ আমোদিত হইতেছে। মধুকর ঝঙ্কার করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধুপান করিতেছে। অশোক, চম্পক, কিংশুক, সহকার, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে এবং তাহাদিগের শাখা ও পল্লবের পরস্পর সংযোগে মধ্যে মধ্যে রমণীয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার অভ্যন্তরে দিনকরের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। মহর্ষিগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন এবং প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার উত্তাপে বৃক্ষের পল্লব সকল মলিন হইয়া যাইতেছে। গন্ধবহ হোমগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুনিকুমারেরা কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে বেদ উচ্চারণ, কেহ বা প্রশান্তভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। মৃগকদম্ব নির্ভয়-চিত্তে বনের চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। শুকমুখভ্রষ্ট নীবারকণিকা তরুতলে পতিত রহিয়াছে।

তপোবন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পুলকিত হইল। অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলাম, রক্তপল্লবশোভিত রক্তাশোকতরুর ছায়ায় পরিষ্কৃত পবিত্র স্থানে বেত্রাসনে ভগবান মহাতপা মহর্ষি

জাবালি বসিয়া আছেন। অন্যান্য মুনিগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মহর্ষি অতি প্রাচীন, জরার প্রভাবে মস্তকের জটাভার ও গাত্রের লোম সকল ধবলবর্ণ, কপালে ত্রিবলী, গণ্ডস্থল নিম্ন-শিরা ও পঞ্জরের অস্থিসকল বহির্গত এবং শ্বেতবর্ণ লোমে কর্ণ-বিবর আচ্ছাদিত। তাঁহার প্রশান্ত ও গম্ভীর আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, তিনি করুণারসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের আধার, শান্তিলতার মূল, ক্রোধভুজঙ্গের মহামন্ত্র, সৎপথের দর্শক ও সৎস্বভাবের আশ্রয়। তাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে একদা ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম মহর্ষির কি প্রভাব! ইঁহার প্রভাবে তপোবনে হিংসা, দ্বেষ, বৈর, মাৎসর্য্য কিছুই নাই। ভুজঙ্গেরা আতপতাপিত হইয়া শিখীর শিখাকলাপের ছায়ায় সুখে শয়ন করিয়া আছে। হরিণশাবকেরা সিংহশাবকের সহিত সিংহীর স্তনপান করিতেছে। করভ সকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুণ্ড দ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করিতেছে; মৃগকুল অব্যাকুলচিত্তে বৃকের সহিত একত্র চরিতেছে এবং শুষ্ক বৃক্ষও মুকুলিত হইতেছে। বোধ হয় যেন সত্যযুগ কলিকালের ভয়ে পলাইয়া তপোবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আশ্রমস্থিত তরুগণের শাখায় মুনিগণের বল্কল শুকাইতেছে, কমণ্ডলু ও জপমালা ঝুলিতেছে এবং মূলদেশে বসিবার নিমিত্ত বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন বৃক্ষ সকলও তপস্বিবেশ ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই সকল দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে মুনিকুমার হারীত আমাকে সেই রক্তাশোকতরুর ছায়ায় বসাইয়া পিতার চরণারবিন্দ বন্দনা পূর্ব্বক স্বতন্ত্র এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য মুনিকুমারেরা তদ্দর্শনে সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া হারীতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে! এই শুকশিশুটী কোথায় পাইলে?" হারীত কহিলেন, "স্নান করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেখিলাম, এই শুকশিশু আপন কুলায় হইতে পতিত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। ইহাকে তাদৃশ বিষম দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইল। কিন্তু যে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করা আমাদিগের অসাধ্য বোধ হওয়াতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি। এই স্থানে থাকুক, সকলকে যত্নপূর্ব্বক উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।"

৺ তারাশঙ্কর তর্করত্ন (সংক্ষিপ্ত)।

আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জ্ঞানোপার্জ্জন।

পরমেশ্বর আমাদিগকে যেরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি করি, এই অভিপ্রায়ে তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কোন অংশে অসুখী থাকি ইহা

তাঁহার অভিপ্রেত নহে ; প্রত্যুত সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সুখী হই ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। আমরা যে আপনাদের স্বভাব মলিন করিয়া রাখি, ইহা কোন মতে তাঁহার অভীষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যুত শরীরকে সুস্থ ও সবল এবং অন্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায় প্রদীপ্ত ও ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করি, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। এই সমুদায় অভিপ্রায় যদি যুক্তিসিদ্ধ হইল, তবে আপনার প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রণালী-বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করা অবশ্যকর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। আপনার উদ্দেশে যত কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে এ কার্য্য সর্ব্ব-প্রধান।

ধর্ম্মোপদেশকেরা যেমন অন্যান্য বৈধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, বিদ্যা-শিক্ষা তাদৃশ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু যখন জ্ঞান ব্যতিরেকে আপন শরীর ও মন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখিবার সম্ভাবনা নাই এবং আপন পরিবার ও অপর লোকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও উচিতমত সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, আর তখন জগদীশ্বর আমাদিগকে তত্তদ্বিষয়ে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন জ্ঞান শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। বাল্যকালাবধিই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ; না শিখিলে প্রত্যবায় আছে।

যখন আমরা মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তখনই আমাদের কতকগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য নিত্য-ব্রতে ব্রতী হওয়া

হইয়াছে। আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা, অন্তঃকরণ জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত করা, সন্তান সন্ততিকে সুশিক্ষিত ও সুখী করা, লোকের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা সাধন পূর্ব্বক জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা এবং সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের অপরিসীম মহিমা ও অপার করুণা-গুণ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্ব-পতি যে বিষয়ে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা না জানিলে, সে বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি আমাদের শরীর রক্ষার্থ কিরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, স্ত্রী-পরিগ্রহ ও পুত্রকন্যার প্রতিপালন বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্যবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থ কোন্ বস্তুতে কি কি গুণ প্রদান করিয়াছেন, রাজ-কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কিরূপ অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও পরমাশ্চর্য্য মহিমা কিরূপে কতদূর শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদায় সম্যক রূপে নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। কি রাজা কি প্রজা, কি ভৃত্য কি স্বামী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেরই এই সমস্ত শুভকর বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানই দুঃখরূপ দারুণ রোগের মহৌষধ, এই জ্ঞানই সুখরত্নের অদ্বিতীয় আকর, এই জ্ঞানই মানব-জন্ম সার্থক করিবার মূলীভূত উপায়।

ইহাই যদি পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইল, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহার যথোচিত ফলোৎপত্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিমিত ভোজন, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস এবং শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা উচিত ইত্যাদি শারীরিক বিধান বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে, বালকেরা তাহা পালন করিলে যত্নবান থাকে, তদ্দারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে সুখে কাল যাপন করিতে পারে এবং বয়োবৃদ্ধি হইলে যাহাতে নগরমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হইয়া ও স্বদেশস্থ বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ভজনালয় প্রভৃতি সাধারণে গৃহসমুদায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অনুকূল হইয়া লোকের স্বাস্থ্য-জনক হয়, তাহার উপায় করিতে পারে। এইরূপ, উদ্বাহ-ধর্ম্ম, গৃহ-কার্য্য ও সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্ব জানিয়া, তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সুখী হইতে পারে এবং স্বদেশের মধ্যে তদনুযায়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশীয় লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইতে পারে। অতএব, দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ পুরস্কার, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যেমন অন্যান্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনের সময়ে মনে মনে সুখানুভব হয়, সেইরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন ও জ্ঞানানুশীলনের সময়েও তাহার পুরস্কারস্বরূপ অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। যখন আমরা কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকাতে, অথবা অন্য কোন কারণে বিরক্ত ও অস্বচ্ছন্দচিত্ত থাকি, তখন পুস্তক-পাঠ

মহোপকারী বোধ হয়। সময় বিশেষে পুস্তক-বিশেষ পঠিত হইলে, পরম-প্রণয়াস্পদ মিত্রের ন্যায় সন্তাপিত হৃদয়কে শান্ত, বিষণ্ণ বদনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কোন অভিমত নিয়ম নিরূপিত হইলে, কত আহ্লাদই উপস্থিত হয়। অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহানুভব্ নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়া যেমন অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন এবং ভুবন-বিখ্যাত মহাত্মা কোলম্বস অগাধ সমুদ্র উত্তরণপূর্ব্বক আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিয়া যেরূপ অভূতপূর্ব্ব প্রভূত সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় হিমালয়তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণ-খণ্ড কর্কশ-রাশি সদৃশ তুচ্ছ বোধ হয়। জগতসংসারের ঐশ্বর্য্যও সে অমূল্য সুখের উচিত মূল্য নহে। দুই এক পরম ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন সামান্য লোকের ভাগ্যে এরূপ অতি প্রগাঢ় আনন্দ সম্ভোগ ঘটে না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল সুখ রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, তাহাতে ভ্রমণ করিতে সকলেরই অধিকার আছে। আমরা তাঁহাদের নিরূপিত এই একটি বিষয় শিক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়া অদ্ভুত সুখ অনুভব করি।

বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্যভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধনেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নর-লোক-নিবাসী হইয়াও, কোন চমৎকারময় সুচারু স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে

নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যাবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব-পরিবৃত স্থল-ভাগ, সমুদ্র-স্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদ-ধারিণী পর্ব্বত-শ্রেণী, কন্দর ও ভৃগুদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষারশৈল, তুষারদ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গ-দেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত, ভূগর্ভ-বিনির্গত গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন এবং তদীয় শিখরদেশ হইতে অগ্নিময়ী নদী স্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক হিমগিরি-শিখরে উত্থিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ত্বরিত হইতেছে এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্র-সলিলের করালতম কল্লোল কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস ও শঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন এবং কত স্থানের কত প্রকার রাজনীতির ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী

থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহিত বাস ও সদালাপ করেন, তখন দেশবিশেষের জলবায়ু, শীত গ্রীষ্ম, গ্রাম নগর, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম শাসন, বিদ্যা ব্যবসায়, সুখ সভ্যতা, পশু পক্ষী, উদ্ভিদ্ ধাতু প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহনে ভ্রমণ করেন, তখন কেবল বৃক্ষ লতা গুল্মাদির পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য মাত্র সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কত প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কারণে কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার-সংবলিত সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত হন এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করিবার সময়েই করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ-সময়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময়ে তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক গগন-মণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্বব্যাপারের অনুশীলনের অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকাণ্ড ভূপিণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা গিরি-কানন, পশু পক্ষী, মেঘ ও বায়ু সংবলিত অপরিসীম আকাশ-মার্গে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনাবর্ত্মে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত

হইয়া উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইয়া চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল অঙ্গুরীয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ষট্ চন্দ্র-সহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চন্দ্রদ্বয়সংবলিত নেপচ্যুন নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্রলোক অবলোকন করত অশৃঙ্খলবদ্ধ ও অক্লিষ্ট পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অসীম আকাশ মণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগনমণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানবজাতির নেত্র-গোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃ-প্রদেশ সঙ্খ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন এবং অপার মহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি রসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ অতিমনোহর সুখ-রাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার পরমোৎকৃষ্ট নিরুপম সুখের উপমা দিবার আর স্থল নাই, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানোপার্জ্জন করা যে মনুষ্যের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উল্লিখিতরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান।

আমাদের আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্যান্য অশেষপ্রকার সুখকর ব্যাপারের ন্যায় শারীবিক স্বাস্থ্য-লাভও আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট দেহ প্রদান করিয়া কতকগুলি মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগারস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগন-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশঃ, প্রভূত মান সম্ভ্রম, কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়েই বিরক্ত এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল। কত কষ্টেই তাহার দিনযাপন হয়! তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়! চির-রোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। তাঁহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত চিত্ত। আহার-বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে

কষ্টে সৃষ্টে কালহরণ করা তাঁহাদের নিত্যব্রত হইয়া, উঠে। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুষ্কর্ম্ম এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট থাকে এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে, শরীরও শীর্ণ হয় এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধ-রিপু প্রবল হয় এবং দয়া, ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু সতত হাস্যবদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না এবং অর্দ্ধ-স্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকল শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর-দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে শরীর বল-হীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে, অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্ব-পতির বিশ্ব-কার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ রসের উদ্রেক হইতে থাকে।

শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে এবং রোগ-শান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মসমুদায় বিহিত-বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবনরক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা, সুখ-সাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থ যত্নবান থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীতি-মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কারণ শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাতা পিতাকে যন্ত্রণা-রূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয় এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রকন্যাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্য সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নি-প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণ-ত্যাগ করা আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর

বিলম্ব এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীর রক্ষার্থ যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

রোগ ও অকাল মৃত্যু-ঘটিত যাবতীয় ক্লেশ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শারীরবিধান-বিদ্যায় যে সমস্ত ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে, তন্মধ্যে উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করত সুস্থ শরীরে কাল যাপন করে। অতএব, এ বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে অশেষপ্রকার উপকার দর্শিতে পারে। বাস্তবিক যে যে বিষয়ে তাহাদের শরীরের সহিত আমাদের শারীরিক প্রকৃতির ঐক্য আছে, সে সে বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার আমাদের আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাদের তত্তদ্ বিষয়ক ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ—ইতর জন্তুরা স্বভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। সকলেই পক্ষীদিগকে অঙ্গ প্রক্ষালন ও পক্ষ-বিন্যাস করিতে

দেখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাহারা পক্ষ সমুদায় মার্জ্জিত ও বিন্যস্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন তাহাদিগকে কেমন সুন্দর দেখায় ও কেমন স্ফূর্ত্তি যুক্ত বোধ হয়! গৃহস্থের গৃহস্থিত বিড়াল গাত্রের লোমগুলি পরিষ্কৃত ও চিক্কণ করিয়া রাখে। ধেনুগণ কত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বৎসের শরীর লেহন করে। অশ্বের শরীর মার্জ্জিত করিয়া না দিলে তৃণাদির উপর লুণ্ঠিত হইতে থাকে। বনের সমুদায় পশুপক্ষীই পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মনুষ্যের আলয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অন্যথা হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ—তাহাদিগকে আহার অন্বেষণার্থ পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অঙ্গ সমুদায়কে যত চালনা করা আবশ্যক, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর এরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, যে নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলেও চলে না।

তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে যে জন্তুর যে যে খাদ্য নিরূপিত আছে, তাহাতেই তাহাদের শরীর সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সবল থাকে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অতি-ভোজন করিয়াও পীড়িত হয় না এবং অহিতকারী দ্রব্য আহার করিয়াও অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয় না।

ইতর জন্তু সকল পরমেশ্বর-প্রদত্ত সংস্কার-বিশেষের বশবর্ত্তী

হইয়া এই প্রকার স্বাস্থ্যকর ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা সে প্রকার অভ্রান্ত সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সে বিষয়ের অভাব পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধিসহকারে শরীরের স্বভাব, প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন এবং ঐ সকল অঙ্গের কার্য্যের রীতি নিরূপণ পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম নির্দ্ধারণ ও পরিপালন করিয়া অতি পবিত্র আরোগ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

আমাদের গাত্র চর্ম্মে আবৃত, সেই চর্ম্ম লোম-কূপে পরিপূর্ণ, এক এক লোম-কূপ শরীরস্থ অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ নির্গত হইবার এক এক দ্বার স্বরূপ। প্রতিদিন ন্যূনকল্পে প্রায় ৮/০ ছটাক নির্গত হইয়া থাকে। যদি লোম-কূপ বদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত অনিষ্টকর পদার্থ বহির্গত হইতে না পায়, তবে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে। রক্ত দূষিত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া লোম-কূপ সমুদায় রোধ করে। অতএব তাহাদিগকে পরিষ্কৃত রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রক্ষালন ও মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র এপ্রকার ছিদ্র-যুক্ত ও পরিষ্কৃত যে অনায়াসে স্বেদ শোষণ করিতে পারে এবং যে বস্ত্রের মধ্য দিয়া স্বেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান করা বিধেয়, নতুবা শরীর

অপরিষ্কৃত থাকিলেও যে প্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও সেইপ্রকার হইয়া থাকে। চর্ম্ম যেমন লোম-কূপ দ্বারা শরীরের নষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার বাহিরের বস্তুও শোষণ করে। অতএব, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জিত না করিলে দুই প্রকার অনিষ্ট থাকে। একপ্রকার এই যে, লোম-কূপ রুদ্ধ হওয়াতে, অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হইতে পায় না, আর একপ্রকার এই যে গাত্রে যে সকল মলা থাকে, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উপস্থিত করে। শরীরস্থ চর্ম্মের এই প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গাত্র বস্ত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়। যাঁহারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা তৎপ্রতিপালনে যেমন যত্নবান্ হন, ইতর ব্যক্তিদিগের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকারে শরীরস্থ অস্থি, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক প্রভৃতির স্বভাব ও প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় স্বাস্থ্য-সাধনার্থ শরীর ও মনের অতিশয় চালনা করা আবশ্যক।

কোন অঙ্গকে নিতান্ত নিশ্চল রাখা উচিত নহে এবং কোন অঙ্গকে অতিমাত্র চালিত করাও শ্রেয় নহে। উভয়ই দোষ, উভয়েতেই শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হয়। সুস্থ শরীরে উৎসাহ সহকারে শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করিলে, আপনাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ হইয়া অতি অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ

নহেন। তাঁহারা যাহাকে ইন্দ্রিয় সুখ কহেন, তাহা শারীরিক-সুস্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

সাংসারিক আচার ব্যবহারে এপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে, প্রায় সকলেই অঙ্গ সঞ্চালন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত দুই দোষের কোন না কোন দোষে লিপ্ত আছেন। ধনীদিগের মধ্যে অনেকে পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া আলস্য-সলিলে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দেন, নির্ধনেরা ধনোপার্জ্জনার্থ নিয়মাতীত পরিশ্রম করিয়া পরমায়ুঃ হ্রাস করিয়া ফেলেন এবং বিদ্যার্থীরা শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর ও জীর্ণ করেন, ও তন্মধ্যে কেহ কেহ চির-রোগী হইয়া বহু কষ্টে সমস্ত জীবন যাপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অনেকানেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিছুকাল পরেই যে ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই—সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি না রাখাতে এবং বিদ্যালয়স্থ সমস্ত ছাত্রকে শারীর-বিধান বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া আপনাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া না জানাতেই, এই মহানর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে বিষয় কর্ম্মের যে প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয় কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম অনুশীলন করিতে অবকাশ পান না। কিন্তু মনুষ্যের সকল প্রকার বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত এবং কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ

করাও কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সর্ব্বোতোভাবে সুখী হওয়া যায় না। যখন পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাস-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তন্নিবন্ধন বৈধ সুখ সম্ভোগ করা কোন মতেই গর্হিত নহে। তাহাদিগকে অসৎ বিষয়ে অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনার্থ নিয়োজন করাই অধর্ম্ম। নির্দ্দোষ আমোদ স্বাস্থ্য-সাধন পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এইরূপে পরিপাক-শক্তি, শোণিত-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া পশ্চাল্লিখিত নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য, যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং যাহাতে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই বাস করা বিধেয়; সচরাচর মাদক সেবন করা অকর্ত্তব্য, প্রতি রাত্রিতে ৬। ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক; মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া ও উপস্থিত বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই সমুদায় নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা। অপর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুভদায়ক আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে পরিলে, ভূমণ্ডলে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ ও তন্নিবন্ধন অশেষপ্রকার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু অত্যাচার করিয়াও কতক দিন সুস্থ থাকিতে দেখা যায়

বটে; কিন্তু শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না এমত বিবেচনা করা উচিত নহে। পরমেশ্বরের অখণ্ড্য আজ্ঞার অবহেলা করিলে সুখে থাকা যায়, এ অতি অর্ব্বাচীনের কথা। ঐ সকল ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ এই নিমিত্ত অধিক অত্যাচার ব্যতিরেকে রুগ্ন ও ভগ্ন হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগত অহরহঃ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ পীড়িত ও অকাল-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। আহা! দিন দিন কত রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্ট তরুণ-বয়স্ক যুবকেরই সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীরকে অত্যাচারে পীড়িত ও ভগ্ন হইতে দৃষ্টি করা যায়। যেমন কোন পুষ্প-কলিকা কীট দ্বারা কর্ত্তিত বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা আহত হইলে, প্রস্ফুটিত না হইতেই বিশীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ, কত শত পরম রূপবান্ মনুষ্যের লাবণ্যরূপ রমণীয় পুষ্প অত্যাচাররূপ বিষম উৎপাত দ্বারা অকালে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি যে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকিয়াও সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারেন না, তাহারও কারণ আছে। হয়, তাঁহারা মাতা পিতার কোন উৎকট রোগ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নয়, আপনারা পূর্ব্বে এমত অত্যাচার করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের শরীর একপ্রকার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগ্ন হইলে পরেও, তাঁহারা শারীরিক নিয়ম পালন করিলে যেমন সুস্থ থাকিতে পারেন, লঙ্ঘন করিলে, কদাচ তেমন থাকিতে পারেন না।

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, শারীরিক নিয়ম নিরূপণ ও প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অপর সাধারণ সকলেরই শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা শ্রেয়ঃ; সমুদায় বিদ্যালয়েই তদ্বিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করান কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগেরও তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্যকৃত্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে যদিও তাঁহারা শরীর-রক্ষার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বমতানুযায়ী অন্যান্য বিষয় যেরূপ যত্ন সহকার শিক্ষা দেন, শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু এক্ষণে বিশ্ব কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যতদূর জানা গিয়াছে, তদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা আমাদের এক প্রধান কার্য্য। সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন না হইলে, অন্যান্য কর্ত্তব্য যথাবিধানে সম্পাদন করা যায় না। অতএব শারীরিক নিয়ম পালন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল ও পরিশোধিত করা আমাদের আত্মা-বিষয়ক তৃতীয় কার্য্য। ধর্ম্মের পর আর পদার্থ নাই। যিনি ধর্ম্মস্বরূপ মহারত্নের যথার্থ মর্য্যাদা জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি তদর্থে অপরাপর সমস্ত বিষয় বিসর্জ্জন দিতে পারেন। পরমেশ্বর মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন, অতএব

তাহাদিগকে উন্নত করিতে ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে তাহাদের বশীভূত রাখিতে নিয়ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন, সচ্চরিত্র লোকের চরিত্র-পাঠ, কীর্ত্তিমান মনুষ্যদিগের কীর্ত্তিশ্রবণ ইত্যাদি যে কোন উপায়ে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ এবং অধর্ম্মের প্রতি-অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে, তাহাই কর্ত্তব্য। আর পান-দোষ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে নিষিদ্ধ। আমরা যখন যে অবস্থায় যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকি না কেন, পুণ্যনদীর পবিত্র নীরে অবগাহন পূর্ব্বক স্বকীয় চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই তৎপর থাকা উচিত। সুচরিত্রের সমান অমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই। যিনি হৃদয়-ভাণ্ডারে এমন অমূল্য ধন সংস্থাপন করিতে পারেন, তিনি পরম ভাগ্যবান্। তাঁহার মনোরূপ মনোহর সরোবর সুনির্ম্মল সুখ-সলিলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

কর্ত্তব্য সম্পাদন ও অকর্ত্তব্য পরিবর্জ্জনই ধর্ম্ম। তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উন্নত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সংযত হয় এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মে। অতএব আমাদের ধর্ম্মোন্নতি ও চরিত্র-শোধন বিষয়ে যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা সেই সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ মধ্যে ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতে থাকিবে। এস্থলে কেবল দুই একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

অনেকে অশ্লীল-বাক্য-কথন, কথা-প্রসঙ্গে পরনিন্দাকরন, আমোদ-বিশেষে সাতিশয় আসক্তি-প্রকাশ, কুলোকের সংসর্গ

ইত্যাদি সামান্য সামান্য কুক্রিয়া করিয়া তাদৃশ দোষ বোধ ও যথোচিত অনুতাপ করেন না এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র যে ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে থাকে তাহাও বিবেচনা করেন না। গুরু দোষই হউক আর লঘু দোষই হউক, কর্ত্তব্যের অন্যথাচরণ হইলে অধর্ম্ম হয় ও তন্নিমিত্ত পরমেশ্বর-সন্নিধানে সাপরাধ থাকিতে হয়। তদ্ভিন্ন কোন দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হইলেই প্রবল হয়। একবার যে কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার প্রতি আর তাদৃশ ঘৃণা থাকে না। অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের যে স্বভাব-সিদ্ধ অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা থাকে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। তাহার হ্রাস হইলেই পাপের পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। যেমন কোন সেতুর কোন স্থানে ছিদ্র হইলে, তদ্দ্বারা প্রতিক্ষণ জল নির্গত হইয়া প্রতিক্ষণই সেই ছিদ্রের আয়তন বৃদ্ধি হয় ও ক্রমে ক্রমে সমুদায় সেতু ভগ্ন হইয়া তাহার সমীপবর্ত্তী ভূম-খণ্ড জলে প্লাবিত হয়, সেইরূপ আমরা যত বার কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার প্রত্যেকবার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া অধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ অল্প অল্প অত্যাচার করিয়া অন্তঃকরণ এমত পাপাসক্ত হইতে পারে যে অবশেষে ঘোরতর কুকর্ম্ম করিতেও আর সঙ্কুচিত হয় না। এক সময়ে যে ব্যক্তি যে কুকর্ম্মের প্রসঙ্গ শুনিবামাত্র অত্যন্ত ঘৃণা ও বিস্ময় প্রকাশ করে, পরে সেই ব্যক্তি অভ্যাসের বশীভূত হইয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে অম্লানবদনে সেই ঘৃণাকর কুৎসিত পাপে

প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব যাঁহারা পুণ্যের পরম পবিত্র মনোহর স্বরূপ প্রতীতি করিয়া তাহাকে হৃদয়াসনে স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন, অতিসমান্য পাপকেও লঘু জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ যে লঘু পাপ হইতে গুরুতর পাপের উদ্ভব হয়, তাহাকে সামান্য জ্ঞান করাই বা কিরূপে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? যখন কোন লঘু পাপের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে কি পর্য্যন্ত ঘোরতর পাপের উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য এবং বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বিধেয়। যেমন পুষ্পোদ্যানস্থিত কণ্টকী লতার অঙ্কুর উৎপাটন না করিলে, তাহা হইতে এক বিশাল লতা উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্পবৃক্ষসকল নষ্ট করিতে পারে, সেইরূপ, পাপাঙ্কুরের মূল উন্মূলন না করিলে অবশেষে তাহা হইতে অতিবৃহতী অধর্ম্ম-লতা উৎপন্ন হইয়া চিত্ত-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে। অতএব কোন সামান্য কুকর্ম্মেরও একবার মাত্রও অনুষ্ঠান করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের যেপ্রকার স্বভাব-সিদ্ধ ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। অসৎ-সংসর্গ এ দোষের এক প্রবল কারণ। অধার্ম্মিক-দিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে যাহাদের প্রবৃত্তি হয়, অধর্ম্মেতে যেরূপ ঘৃণা থাকা উচিত তাহা তাহাদের কখনই থাকে না। স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে। যে

পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া অসৎ-সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে, তদ্দ্বারা অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হ্রাস হইতে পারে, পরিশেষে নানাপ্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সাধুসঙ্গের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেমন পরম শোভাকর পূর্ণচন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মস্বরূপ সুধারস সঞ্চার করিতে থাকেন। তাঁহাদের সহিত সহবাসে যাহার অত্যন্ত অনুরাগ ও পরম পরিতোষ জন্মে এবং আপনার অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও পবিত্র রাখিতে যাহার একান্ত যত্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই অধর্ম্মকে দুর্গন্ধবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখ-সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে। পরম রমণীয়-পুষ্পোদ্যান-স্থিত, বিশুদ্ধ-বায়ু-সেবিত, পরিপাটী গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা যাঁহার সতত অভ্যাস, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ন্যাক্কারজনক, অপরিচ্ছন্নস্থানে বাস করিতে অবশ্যই তাঁহার ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি আত্ম-প্রসাদ ও সাধু সঙ্গ অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তল্লাভার্থে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন এবং তাহা লাভ করিয়া পরম পবিত্র আনন্দ-রস অনুভব করেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে অন্যান্য অপেক্ষায় অধিক সমর্থ তাহার

সন্দেহ নাই। অতএব অধর্ম্মের আক্রমণ নিরাকরণার্থ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ লাভে সতত সযত্ন থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আত্ম-সুখ সাধন করা আর একটি আত্ম-বিষয়ক কার্য্য। যে স্থলে আপনার সুখ-সৌভাগ্য সাধন করা অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিরোধী না হয়, সে স্থলে তদর্থে চেষ্টা করা কোন ক্রমেই গর্হিত নহে। যদি সকলেই স্ব স্ব সুখ লাভ বিষয়ে অযত্ন ও অবহেলা করে, তবে সকলেই বিবিধ সুখে বঞ্চিত ও নানা দুঃখে আকীর্ণ হওয়ায়, সংসার-ধাম কেবল নিরানন্দ দুঃখ-ধাম হইয়া উঠে। অতএব পরোপকার যেরূপ পুণ্যকর্ম্ম, ধর্ম্ম-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক আত্ম-সুখ সাধন করাও সেইরূপ এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই।

যথানিয়মে শরীর ও মনের চালনাই সুখের মূল। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-রত্নের এক এক আকর স্বরূপ। করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে তাহাদিগকে চালনা করিলেই, আন্তরিক সুখ ও সাংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বর মানবজাতিকে যে সমস্ত শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সমুদায় বাহ্য বিষয় তাহাদের সম্পূর্ণরূপ উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল বিষয়ে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। শরীরসঞ্চালনের বিষয় শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধানের প্রসঙ্গ-মধ্যে লিখিত হইয়াছে এবং প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি ও

ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক জ্ঞানামৃত পান ও ধর্ম্মরূপ অমূল্য-নিধি লাভ যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের সমুৎপাদক, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জনিত বিহিত সুখেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীশ্বর জগতের কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখসৌভাগ্য লাভ করিব এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক এক ইন্দ্রিয় ও এক এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্য্যাপ্ত সুখের আধার করিয়াছেন। বসন্তকালে যখন পৃথিবী নানা রসে পরিপূরিত হইয়া পরমরমণীয় পুষ্প পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে এবং পুষ্পভারাবনত তরুশাখাসকল সুমন্দ-মরুতহিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত কুসুমবর্ষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে ও বৃক্ষশাখারূঢ় বিহঙ্গম সকল মুহুর্মুহুঃ শাখাপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক মধুর স্বরে মনের সুখে গান করত পথিকের মন হরণ করে, তখন যাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত না হইয়া কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে! ন্যায়ানুগত থাকিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক ধন, মান ও যশঃ উপার্জ্জন করা অশেষ সুখের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিহিত বিষয়ে নিয়োজনপূর্ব্বক সুখ-সৌভাগ্য লাভ করা কোন রূপেই গর্হিত নহে। প্রত্যুত স্বকীয় সুখ সম্পত্তি সাধন অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধী না হইলে, তদর্থে চেষ্টা

করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিসমুদায়কে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশীভূত রাখা আবশ্যক; নতুবা মোহ-কূপে পতিত হইয়া পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।

কোন কোন উপাসকসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ-সাধনকে ইন্দ্রিয়-সংযম জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা করেন, কেহ বা শরীর শুষ্ক ও ক্লিষ্ট করাকে ধর্ম্ম-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যের যেরূপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা সবিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সমস্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক বোধ হয়। দয়াসাগর বিশ্ববিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে যে সমস্ত সুখ সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার ও সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ করণার্থ চেষ্টা করিলে, তাঁহার অপার কারুণ্য-স্বরূপে অবহেলা করা হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার সমীপে অপরাধী থাকিয়া বিবিধ সুখে বঞ্চিত হইতে হয়।

উপস্থিত প্রস্তাব সমাপণ করিবার পূর্ব্বে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইতেছে। সুখ-স্বস্তি যেমন দুর্ল্লভ পদার্থ, উদ্বেগ ও বিরক্তি তেমনি ক্লেশকর। মনের স্বস্তি ব্যতিরেকে ধন, মান, সম্ভ্রম সকলই বৃথা, কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। কত শত ব্যক্তি অতুল-ঐশ্বর্য্যবান্ ও প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়াও নিয়ত এরূপ উৎকণ্ঠিত ও উত্ত্যক্ত, যে কিছুতেই তাহাদের স্বস্তি হইবার সম্ভাবনা

নাই। কাহারও বা কোন দুরাশা পূর্ণ না হইলে অবিরতই অসুখ ও উৎকণ্ঠা থাকে। কেহ বা কোন অসিদ্ধ সংকল্প অথবা কোন পূর্ব্বাচরিত ভ্রান্তিমূলক ক্ষতিজনক ব্যাপার স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা সন্তাপিত। কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ যে, কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহাদের যত অর্থ লাভ ও যত পদ বৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসারূপ অগ্নি-শিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকে।

অনেকের স্বভাব দোষ এরূপ উদ্বেগ ও অস্বস্তির এক প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেচনা ও অভ্যাস দ্বারা ঐ উভয়ের অনেক হ্রাস করা যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ক্লেশ কেবল কুসংস্কার-মূলক, জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া কুসংস্কার-বিমোচন হইলেই তাহা দূর হইতে পারে। আর সন্তোষ উক্তরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ স্বরূপ। সন্তোষ অপেক্ষায় সুখজনক এবং অসন্তোষ অপেক্ষায় দুঃখ-জনক আর কিছুই নাই। মনুষ্য সকল অবস্থাতেই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখ-স্বরূপ স্বর্ণ লাভের সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে দুঃখ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে এমত নহে। যে অবস্থায় থাকিলে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ বশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপরিষ্কৃত, অপরিশুষ্ক, সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সঙ্গতি অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করাইতে এবং পুত্র ও কন্যাদিগকে উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করাইতে অসমর্থ

হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এই সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করিবার নিমিত্ত যত্ন না করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানামতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়, অতএব কোন মতেই উচিত নহে। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এরূপ নয়। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা যতদূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতে তৃপ্ত হওয়া এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষ। এরূপ সন্তোষ সুখের আলয়।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত (সংক্ষিপ্ত)।

জন্ ফ্রেডরিক্ ওবর্লিন্।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইল, তাঁহাকে দয়া গুণের অবতার বলিলেও বলা যায়। তিনি ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ্ রাজ্যের অন্তঃপাতী ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালাবধি অকৃত্রিম দয়া ও বাৎসল্যের প্রকাশ করিয়া পরিজনবর্গের স্নেহ-পাত্র হইয়াছিলেন, বাল্যকালে স্বকীয় সামান্যরূপ উপস্থিত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতি শনিবার পিতার নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা একটি মুদ্রাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং একত্র করিয়া পরিজনদিগেরও অপর লোকের উপকার্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, পার্য্যমানে কাহারও ঋণ রাখিতেন না। কখনও কোন ব্যবসায়ী লোক তাঁহার নিকট কোন ক্রীত বস্তুর মূল্য গ্রহণ করিতে আগমন করিলে, যদি তিনি অর্থের অসঙ্গতি প্রযুক্ত তৎকালে তাহা পরিশোধ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে ম্রিয়মাণ ও অধোমুখ হইয়া থাকিতেন। জন্ ফ্রেডরিক্ ওবর্লিন আপনার পিতার এরূপ বিষণ্ণবদন দর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ আপনার মুদ্রাগারের নিকট গমন করিয়া, তন্মধ্যে যত মুদ্রা পাইতেন, সমুদায় আনিয়া অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে পিতার হস্তে অর্পণ করিতেন।

তাহার শৈশবকালীন কারুণ্য ও বদন্যতা-ঘটিত উক্তরূপ ভূরি ভূরি আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি পরের দুঃখ দূরীকরণার্থ

আপনার কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে কখনও কাতর হইতেন না। প্রত্যুত পরোপকার করনের স্থল উপস্থিত হইলে সাতিশয় সুখী হইতেন। এক দিবস একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি ডিম্ব মস্তকে করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, পথের মধ্যে কয়েকটি দুর্ব্বিনীত নিষ্ঠুর বালক ধাক্কা দিয়া তাহা ফেলিয়া দিল। ইহা দেখিয়া ওবর্লিন্ তাহাদিগকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন এবং আপনার মুদ্রাধারে যত মুদ্রা ছিল, সমুদায় আনিয়া ঐ স্ত্রীলোককে দান করিলেন।

অন্য একদিন তিনি এক বস্ত্রবিক্রেতার বিক্রয়গৃহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোক একখানি বস্ত্র ক্রয়ার্থ ব্যগ্র হইয়াছে, কিন্তু উক্ত বস্ত্রব্যবসায়ীর আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত মূল্য প্রদানে সমর্থ হইতেছে না। ওবর্লিন্ কর্ম্মান্তর উপলক্ষ করিয়া উল্লিখিত বিক্রয় গৃহের সমীপদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, ঐ স্ত্রী বস্ত্রক্রয়ে অপারগ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল দেখিয়া, বস্ত্রের নির্দ্ধারিত মূল্যের মধ্যে তাহার যাহা অকুলান ছিল, তাহা সেই ব্যবসায়ীর হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন ঐ স্ত্রীলোককে আহ্বান করিয়া তাহার অভিলষিত বস্ত্রখানি প্রদান কর। এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে গমন করিলেন, তাহার আশীর্ব্বচন শ্রবণার্থ অপেক্ষা করিলেন না।

ওবর্লিনের জনক-জননীর চরিত্রও অত্যুত্তম ছিল। তাঁহাদের উপদেশ-গুণে ও সৌজন্য দর্শনে ওবর্লিনের স্বভাব-সিদ্ধ দয়া ও বাৎসল্য তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং

বাল্যকালে তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে যে পরম রমণীয় ধর্ম্মাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট অমৃতময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল।

ওবর্লিন্ চিকিৎসা-শাস্ত্রাদি নানাপ্রকার হিতকারী বিষয় সহকারে ধর্ম্মশাস্ত্রও উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ্ দেশের অন্তর্গত আল্‌সাস প্রদেশের ওয়ল্‌ডবাথ্ নামক স্থানে গ্রাম্যযাজকতা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থান বাঁদেলারোষ নামক উপত্যকা ভূমির অন্তঃপাতী। সে সময়ে উল্লিখিত জনপদ-নিবাসীরা দারুণ দুরবস্থায় পতিত ছিল। ওবর্লিনের সদয় অন্তঃকরণ অন্যের দুঃখ দূরীকরন বিষয়ে যেরূপ ব্যগ্র, তাহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। অতএব, সে সময়ে তাহাদের যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ আবশ্যক ছিল, তাহারা সেইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ওবলিন তাহাদিগকে কেবল ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া নিরস্ত হন নাই, সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাহারা দরিদ্র মূর্খ, দুর্ব্বিনীত ও স্বাবলম্বিত কৃষিকার্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়েই অপটু ও অনভিজ্ঞ ছিল। ওবর্লিন্ তাহাদের ঐ সমস্ত দোষ সংশোধনার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তাহার নানা উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার অনুকম্পা-সূচক অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিকূল হইয়া উঠিল। এমন কি, সকলে ঐক্য হইয়া তাঁহাকে পথিমধ্যে প্রহার ও জলমধ্যে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

যাহারা এতাদৃশ অনভিজ্ঞ ও দুর্ব্বিনীত যে, আপন হিতাহিত

বিবেচনা করিতে অক্ষম, তাহাদের সহিত বাদানুবাদ করা বিফল জানিয়া তিনি অবশেষে এই অবধারণ করিলেন যে, ইহাদের কোন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুনীতিশালী জনপদে গমনাগমন থাকিলে, তত্রত্য লোকের সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়া, পর্য্যাপ্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি ও সুপ্রণালী-সিদ্ধ পরিশ্রমাবলম্বনের সমুচিত ফল হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন অনতিদূরবর্ত্তী ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগর সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও সভ্যলোক-সমাকীর্ণ, তথায় ইহারা আপনা-দিগের দ্রব্যজাত লইয়া বিক্রয় করিলে ও তথা হইতে আপন জনপদের শ্রীবৃদ্ধি-সধেনের উপযোগী নানা সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিলে, বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে। অতএব তথায় গমনাগমনার্থ এক সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করা আবশ্যক ও মধ্যে ব্রস নামে যে নদী আছে, তাহার উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অবধারণ করিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আপন অভিপ্রায় অবগত করিলেন এবং কহিলেন, নদীর ধার দিয়া এক প্রস্তরময় প্রাচীর ও তাহার উপরে এক সেতু নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, অতএব তদর্থে তোমাদিগকে পর্ব্বত ছেদন করিয়া প্রস্তর আনয়ন করিতে হইবে। তাহারা শুনিয়া একার্য্য সাধন করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া উঠিল এবং এক এক করিয়া সকলেই এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিন্তু ওবর্লিন্ কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবার নহেন; তাহা-দিগকে নানামতে উপদেশ দিলেন ও অনেক প্রকার যুক্তিপ্রদর্শন করিলেন; কোন ক্রমেই সম্মত করিতে পারিলেন না। অবশেষে আপন স্কন্ধে কুঠার স্থাপন করিয়া ও এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে

সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্তর কর্ত্তন করিতে চলিলেন। পাষাণ পতিত হইয়া তাঁহার হস্ত পদাদি আহত হইল এবং কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাঁহার ভুজদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহার সদয় হৃদয় পর-দুঃখ-হরণে পরাঙ্মুখ হইবার নহে। তিনি উক্ত বিষয় সম্পাদনার্থ যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেন এবং আপনার পূর্ব্বতন মিত্রদিগকে তদর্থে অনুরোধ জানাইয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন।

তাঁহাকে অধিককাল একাকী পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তাঁহার শিষ্যেরা অবিলম্বেই সহকারী হইল। তিনি রবিবারে রীতিমত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; অন্যদিন প্রাতঃকালে স্বগণসমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত কল্যাণসূচক কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করিতেন। তিন বৎসরের মধ্যে পথ প্রস্তুত হইল, সেতু নির্ম্মিত হইল ও ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরে তাঁহার লোকদিগের গতায়াত আরব্ধ হইল। সভ্যদিগের সহিত অসভ্য লোকদিগের আলাপ পরিচয় ও দেখা ও সাক্ষাৎ হইলে অসভ্যদিগের যাদৃশ উপকার দর্শে তাহা অবিলম্বেই দর্শিতে লাগিল। ওবর্লিন্ আপন লোকদিগকে শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিবার বাসনা করিলেন এবং তদর্থে কতিপয় বালককে ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরস্থ সুনিপুণ সূত্রধর, কর্ম্মকার, ভাস্কর, কাচ-কর্ম্মকার ও শকটকারের নিকট তাহাদের ব্যবসায় শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। উল্লিখিত বালকেরা তথায় শিক্ষিত হইয়া স্বপ্রদেশে গিয়া ঐ সমস্ত শিল্পকর্ম্ম আরম্ভ করিল। যে সকল সমৃদ্ধি-সাধক ও সুখ-সম্পাদক ব্যবসায় তথায় কোন কালে প্রচারিত

ছিল না, তাহা এইরূপে উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল এবং তদবধি ওয়ল্ডবাথ্ নিবাসীরা ওবর্লিন্‌কে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল।

তত্রত্য লোকেরা কৃষিকর্ম্মে সুনিপুণ ছিল না, এ নিমিত্ত ওবর্লিন তাহাদিগকে তদ্বিষয়েও উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। প্রথমে তাহারা অত্যন্ত আপত্তি উত্থাপন করিল এবং "পৌরজনেরা শস্যোৎপাদন বিষয়ে কি জানে" এই কথা বলিয়া তাহার উপদেশে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ওবর্লিন পরোপকার পালনে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তাহাদের সহিত বিতর্ক করা ব্যর্থ জানিয়া তিনি কৃষিকার্য্য বিষয়েও স্বয়ং শুভ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার বাসগৃহের সমীপে দু'টি প্রশস্ত উদ্যান ছিল, তাহা খনন করিয়া সার দিয়া ফল বৃক্ষ রোপণ করিলেন। বৃক্ষ সমুদায় শীঘ্র সতেজ ও উন্নত হইয়া উঠিল দেখিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং তাহারা নিগূঢ় মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহাদিগকে আপনার অবলম্বিত কৃষি-প্রণালী অবগত করিলেন, তাহারাও উক্ত প্রণালী বিষয়ে অত্যন্ত অনুরক্ত ও উৎসাহিত হইল এবং অনধিক বৎসরের মধ্যে তাহাদের কুটীর সমুদায় চতুর্দ্দিকে ফল-পরিপূর্ণ প্রকৃত উদ্যানে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। তদ্ভিন্ন তিনি গোল আলু, শণ ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের রীতি উপদেশ দিলেন এবং কৃষিজীবীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ একটি কৃষি-সমাজ সংস্থাপন করিলেন। যাহারা

কৃষিকার্য্যে বিশিষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করিত, তাহাদিগকে ঐ সমাজ হইতে পারিতোষিক প্রদান করিতেন।

এবম্প্রকারে বাঁদেলারোষের যাজকতা-পদে নিযুক্ত হইবার পর দশ বৎসরের মধ্যে তিনি তদন্তঃপাতী পঞ্চগ্রাম নিবাসী লোকদিগের পরস্পর সকল গ্রামে ও ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরে গমনাগমনার্থ সুন্দর পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ঐ সকল গ্রামে নানাবিধ শিল্পকার্য্য প্রচলিত করিলেন এবং তথাকার কৃষিকর্ম্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করিলেন।

যে যে বিষয় শিক্ষা করিলে অন্নাচ্ছাদনের ক্লেশ দূর হয় ও পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, ওবর্লিন যুবা ও প্রৌঢ়দিগকে সেই বিষয়সমস্ত শিক্ষা দিয়া বালকগণকে অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যৎকালে তিনি বাঁদেলারোষের যাজকতা-পদ গ্রহণ করেন, তখন তথায় এক যৎসামান্য কুটীরে একটী পাঠশালা সংস্থাপিত ছিল, পাঁচ গ্রামের বালকেরা সেই কুটীরে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। ইহা দেখিয়া ওবর্লিন্ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এক অভিনব পাঠ-গৃহ প্রস্তুত করিবার মানস করিলেন। মনে করিয়াছিলেন তত্রত্য লোকেরা এ বিষয়ে আনুকূল্য করিবে, কিন্তু তাহারা আপনাদের মূর্খতা-দোষে নূতন পাঠ-মন্দির নির্ম্মাণ অনাবশ্যক বিরেচনা করিয়া সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। পরম দয়ালু ওবর্লিন্ কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবার নহেন, ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরীয় স্বকীয় মিত্রবর্গকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ জানাইলেন এবং আপাততঃ, আপনি সমুদায়

ব্যয় স্বীকার করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনতি-বিলম্বে ওয়ল্ডবাথ্ নামক স্থানে এক পাঠ-মন্দির প্রস্তুত হইল এবং তাহা দেখিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর স্থানের লোকেরা এক এক স্বতন্ত্র পাঠগৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সমুদায় সম্পন্ন হইলে পরেও, উপযুক্ত অধ্যাপকের অসদ্ভাবে উল্লিখিত বিদ্যালয় সকলের শিক্ষা-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইল। ওবর্লিন্ পরোপকাররূপ পবিত্র ব্রতের কোন অঙ্গ অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না; তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে অধ্যাপকতা কার্য্যে সুশিক্ষিত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

বালকগণের শিক্ষা-সংসাধনের প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া ওবর্লিনের ক্ষোভ নিবৃত্ত হইল না। দুই বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে শিশুরা নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহা হইলে তাহাদের উত্তরকালীন শিক্ষা নির্ব্বাহও সহজ ও সুসাধ্য হইতে পারে, এই বিবেচনায় তিনি কতিপয় শিশু-শিক্ষালয় সংস্থাপন করিলেন। দুই বৎসরের অন্যূন ও ছয় বৎসরের অনধিক বয়সের শিশুরা সেই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। ওবর্লিন্ তৎসমুদায়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে কয়েক জন নির্ব্বাহিকা নিযুক্তা করিয়াছিলেন, নিজেই তাহা দিগকে বেতন প্রদান করিতেন। তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে এতাদৃশ অল্পবয়স্ক শিশুগণের বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না, তিনি বাঁদেলারোষ নিবাসী বর্ব্বরদিগের শিক্ষা সাধনার্থ উহা প্রথম সৃষ্টি করিলেন।

ঐ সমস্ত শিশু শিক্ষালয়ে ছাত্রেরা কেবল বর্ণমালা আবৃত্তি করিয়া কালক্ষেপ করিত না। সূচি কর্ম্ম, তন্তুতনন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিত এবং শ্রান্তি বোধ হইলে পশু পক্ষ্যাদির চিত্রময় প্রতিরূপ এবং ইয়োরোপ, ফরাশিশ্, আল্সাস প্রভৃতি নক্সা পর্য্যবলোকন করিত, মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম সংক্রান্ত সঙ্গীত গান করিয়া পুলকিত হইত। ইহাতে তাহাদের শিক্ষা লাভ করা ক্লেশকর বোধ হইত না; তাহারা শিক্ষা স্থান সুখের স্থান ও শিক্ষা কার্য্য সুখের কার্য্য জ্ঞান করিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁদেলারোষের বালকেরা অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্ঞানাভাবে মূর্খ হইয়াছিল, দয়াময় ওবর্লিনের অনুগ্রহে তাহারা লিখন, পঠন, অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ, পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, তুর্য্যশাস্ত্র, চিত্রবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা ও পশ্বাদির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে লাগিল। ওবর্লিন নিজে তাহাদিগকে ধর্ম্ম শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন এবং সমুদায় শিষ্যের একত্র সমাগমনার্থ এক সাপ্তাহিক সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাস্বুর্গ ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী নগরনিবাসীরা অসামান্য কারুণ্যশীল বদান্যবর ওবর্লিনের এই সমস্ত অদ্ভুত ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও তাঁহার আনুকূল্যার্থে চতুর্দ্দিক হইতে ভূরি পরিমাণ অর্থ প্রেরণ ও বিষয় দান করিতে লাগিলেন। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া, আপনার অনুকম্পা প্রয়োজিত অন্যান্য হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিলেন, বালকগণের উপকারার্থ পুস্তকালয় সংস্থাপিত করিলেন, ছাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী বহুপ্রকার পুস্তক

মুদ্রিত করিলেন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিলেন এবং উপযুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

বাঁদেলারোষ নিবাসীদিগের পরমবন্ধু দয়া-সিন্ধু ওবর্লিন্ তাহাদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা উভয় বিষয়েই তুল্যরূপ প্রগাঢ় যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিপ্রকাশ এবং মানবজাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন উভয়ই কর্ত্তব্য ও আবশ্যক বলিয়া উপদেশ দিতেন। যে কোন বিষয় তাহাদের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও সুখোৎপাদন বিষয়ে উপকারী হইতে পারে, তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা করাইতেন। বাঁদেলারোষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে সাহায্য করা তাহাদের বিশেষরূপ কর্ত্তব্য, ইহা তাহাদিগের সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন এবং সর্ব্বসাধারণ শুভপ্রিয় পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে বৃক্ষ রোপিত এবং পথ পরিষ্কৃত ও সুশোভিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন। তাহারা তাঁহার উপদেশানুসারে উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রের কর্ম্ম-নির্ব্বাহ বিষয়ক প্রস্তাব করিত, অরণ্যমধ্যে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য বৃক্ষাদি অন্বেষণ করিয়া আনিয়া আপন আপন উদ্যানে রোপণ করিত এবং তদীয় পুষ্পসমুদায়ের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়া দেখাইত। যে বালক যতদিন ন্যূন সংখ্যায় দুটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিত, ততদিন তাহার ধর্ম্ম-দীক্ষা-সংক্রান্ত চরম ক্রিয়া সমাপন করিয়া দিতেন না।

এইরূপে একব্যক্তির চেষ্টায় বাঁদেলারোষনিবাসী অবিনীত অসভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুবিনীত হইয়া উঠিল, তাহাদের মূর্খতা দূরীকৃত হইল, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইল, অনেক প্রকার উপজীবিকা সমুদ্ভাবিত হইল এবং বিংশতি বৎসরের মধ্যে বাঁদেলারোষের লোকসংখ্যা ছয় গুণ হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদয় ও অনুকূল ছিল, প্রধান লোকদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা করিত, এবং সকলেই এক প্রকার উপজীব্য অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কালযাপন করিত। যে প্রকারে হউক ওবর্লিন সকলেরই এক একটা উপজীবিকা উপস্থিত করিয়া দিতেন।

এই অশেষগুণসম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি জীবনের সার্থক্যসাধক পরোপকার ব্রতে চিরজীবন ব্রতী থাকিয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সাতাশি বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত আবৃত্তি করিতে করিতে অন্তঃকরণ বিকসিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইতে থাকে। তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করা চরিতাখ্যায়কের পরম সুখের বিষয়। তিনি পর-দুঃখ-হরণার্থ যাদৃশ যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ প্রকাশ ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অবিচলিতচিত্তে দুর্নিবার প্রতিবন্ধক সমুদায় নিরাকরণ করিয়া বাঁদেলারোষনিবাসী-দিগের যে প্রকার উপকার সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে উপদেশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহাদের জনপদ বিশেষের উপকার সাধন করিবার উপায় ও সম্ভাবনা আছে, এই মহাত্মার চরিত্রকে আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।

—————— (৺অক্ষয়কুমার দত্ত।)

বিক্রমাদিত্য।

১

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে নৃপতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজবাহুবলে লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, 'জগদীশ্বর আমায় নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিতচিন্তার ভার দিয়াছেন। আমি আত্মসুখে নিরত হইয়া তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না; কেবল অধিকৃতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহারা প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, অন্ততঃ একবারও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব আমি প্রচ্ছন্ন-বেশে পর্য্যটন করিয়া প্রজাগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব। অনন্তর তিনি নিজ অনুজ ভর্ত্তৃহরির হস্তে সমস্ত

সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

২

এদিকে রাজা ভর্ত্তৃহরি সংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 'সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই; অতএব বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আর ইহাতে লিপ্ত থাকা কোন ক্রমেও শ্রেয়স্কর নহে। অতএব সংসারযাত্রা বিসর্জ্জন দিয়া অরণ্যে গিয়া জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই; চরমে পরমপুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।' অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিয়া, রাজ্যাধিকারে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য রহিল। দেবরাজ উজ্জয়িনীর অরাজকতাসংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র এক যক্ষকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যক্ষ সাতিশয় সতর্কতাপূর্ব্বক অহোরাত্র নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই দেশে বিদেশে প্রচার হইল, রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন-প্রস্থান করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি অর্দ্ধরাত্র সময়ে নগরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে নগররক্ষক যক্ষ আসিয়া নিষেধ করিয়া কহিলেন, "তুই কে? কোথায় যাইতেছিস্? দাঁড়া, তোর নাম কি, বল্।" রাজা কহিলেন, "আমি বিক্রমাদিত্য

আপন নগরে যাইতেছি ; তুই কে ? কি নিমিত্ত আমার গতিরোধ করিতেছিস্, বল্।”

যক্ষ কহিল, “দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগরের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে আমি তোমায় অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না। অথবা যদি তুমি যথার্থ ই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধ কর, পরে নগরে যাইতে দিব।” রাজা শ্রবণমাত্র বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, যক্ষও তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজা যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল, “মহারাজ, তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছ। তোমার প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তুমি যথার্থ ই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও ; আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি।”

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “তুই বাতুল, নতুবা এরূপ কথা বলিবি কেন ? তুই আমায় প্রাণদান কি দিবি ; আমি মনে করিলে এখনই তোর প্রাণদণ্ড করিতে পারি।” যক্ষ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, “মহারাজ, যাহা কহিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ। কিন্তু আমি তোমায় আসন্নমৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে দীর্ঘজীবী হইবে এবং নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে।” তখন ভূপতি অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া

যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন; যক্ষও ক্ষণমধ্যেসমরশ্রান্তি-পরিহারপূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া তদীয় জীবন-সংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ, শ্রবণ কর। ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি এক দিবস মৃগয়ার অভিলাষে কোন অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক তপস্বী অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তত্রত্য লোকের মুখে অবগত হইলেন, তপস্বী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; বহুকাল অবধি একাকী এইভাবে তপস্যা করিতেছেন। রাজা সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার কৌশলে তপস্বী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, ধূমপান পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে জলাঞ্জলি দিয়া বিষয় বসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল। তখন তিনি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "দুরাত্মা চন্দ্রভানু ঐশ্বর্য্যামদে মত্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া আমার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল। আমিও অতি অধম ও অবশেন্দ্রিয়; অনায়াসে চিরসঞ্চিত কর্ম্মফলে বঞ্চিত হইলাম।" অনন্তর ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; অন্য

এক অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায়সহকারে যোগ সাধন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে ঐ নরেশ্বরের মৃত্যুসাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া যক্ষ কহিল "মহারাজ, তুমি ও রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ যোগী, এই তিন জন এক নগরে, এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে জন্মিয়াছিলে। তুমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ, চন্দ্রভানু তৈলিক-গৃহে জন্মিয়া ভাগ্যক্রমে ভোগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল, আর যোগী কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন হইয়া যত্নপূর্ব্বক যোগসাধনকরিয়া, চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়াছে এবং তাঁহাকে বেতাল করিয়া শ্মশানবর্ত্তী শিরীষবৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিয়াছে; এক্ষণে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তোমার প্রণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে; ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই উহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাও, বহুকাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। আমি সবিশেষ সমস্ত কহিয়া তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম, তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমাত্রও অনবহিত থাকিবে না।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া যক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল; রাজাও শুনিয়া ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, ভৃত্যগণ ও প্রজাবর্গ বহু দিনের পর রাজ সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন হইল। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ-নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

৩

কিছুদিন পরে শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী শ্রীফল-হস্তে রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীফলপ্রদানপূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর তিনি অন্তঃকরণে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি কি না? যাহা হউক, সহসা শ্রীফল ভক্ষণ করা উচিত নহে। রাজা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কোষাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই শ্রীফল সাবধানে রাখিবে। সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদর্শন ও শ্রীফল প্রদান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে মন্দুরাসন্দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীফলপ্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। দৈবযোগে শ্রীফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব রত্ন নির্গত হইল। রাজা ও রাজবয়স্য-গণ তদীয় প্রভাদর্শনে চমৎকৃত হইলেন। রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কিজন্য আমায় এই রত্নগর্ভ শ্রীফল দিলেন?

যোগী কহিলেন, মহারাজ, শাস্ত্রে রাজা, গুরু, জ্যোতির্ব্বিদ্ ও চিকিৎসকের নিকট রিক্ত হস্তে যাইতে নিষেধ আছে, এইজন্য আমি

এই রত্নগর্ভ শ্রীফল লইয়া আসিয়াছিলাম। আর এক রত্নগর্ভ শ্রীফলের কথা কি কহিতেছেন, প্রতিদিন আপনাকে যে শ্রীফল দিয়াছি, সকলের মধ্যেই এতাদৃশ এক এক রত্ন আছে।” তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন, “তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি, সমুদায় এই স্থানে আন।” কোষাধ্যক্ষ রাজকীয় আদেশ অনুসারে সমস্ত শ্রীফল তথায় উপস্থিত করিলে, রাজা প্রত্যেক শ্রীফল ভাঙ্গিয়া সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমনপূর্ব্বক এক মণিকারকে ডাকাইয়া ঐ সমস্ত রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, “এই অসার সংসারে ধর্ম্মই সার পদার্থ, অতএব তুমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দাও।”

এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মণিকার কহিল, “মহারাজ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষা করিলে সকল বিষয়ের রক্ষা হয়, ধর্ম্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়; অতএব আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপন জ্ঞান অনুসারে যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিব।” ইহা কহিয়া সে প্রত্যেক রত্নের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া কহিল, “মহারাজ, বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সকল রত্নই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কোটি মুদ্রাও একৈকের প্রকৃত মূল্য নহে। এ সকল অমূল্য রত্ন।”

রাজা শুনিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, সমুচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক মণিকারকে বিদায় করিলেন এবং হস্ত দ্বারা সন্ন্যাসীর

হস্তগ্রহণ করিয়া সিংহাসনার্দ্ধে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "মহাশয়, আমার সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনার প্রদত্ত রত্নসমূহের তুল্যমূল্য হইবে না। আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এ সকল অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন এবং কি অভিপ্রায়েই বা আমায় দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি। যোগী কহিলেন, "মহারাজ! ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র এ সকল সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। যদি অনুমতি হয়, নির্জ্জনে গিয়া নিবেদন করি। মহারাজ, নীতিজ্ঞেরা বলেন, মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাতে কার্য্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, চারিকর্ণ হইলে প্রকাশিত হয় না অথচ কার্য্যসিদ্ধি করে, আর দুই কর্ণের মন্ত্রণা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক ; ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না।"

ইহা শুনিয়া রাজা সন্ন্যাসীকে নির্জ্জনে লইয়া কহিতে লাগিলেন "যোগীশ্বর, আপনি আমায় এত রত্ন দিলেন, কিন্তু একদিনও আমার আলয়ে ভোজন বা জলগ্রহণ করিলেন না, এজন্য আমি আপনার নিকট অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। যদি আপনার কোন অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত করুন ; আমি প্রাণান্তেও তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না।" সন্ন্যাসী কহিলেন "মহারাজ, গোদাবরীতীরবর্ত্তী শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাতে অষ্টসিদ্ধি-লাভ হইবে। অতএব তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই, তুমি একদিন সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত আমার সন্নিহিত থাকিবে। তুমি সন্নিহিত থাকিলেই আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।" রাজা কহিলেন "আমি অবধারিত যাইব, আপনি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া বলুন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তুমি আগামী ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সন্ধ্যাকালে একাকী আমার নিকটে যাইবে।" রাজা কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আমি নিঃসন্দেহ যথাসময়ে আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইব।" এইরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

৪

কৃষ্ণচতুর্দ্দশী উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী সায়ংসময়ে আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীসংগ্রহপূর্ব্বক শ্মশানে যোগাসনে বসিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া করে তরবারি ধারণপূর্ব্বক একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সন্ন্যাসীর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে। সন্ন্যাসী যোগাসনে আসীন হইয়া দুই হস্তে দুই নর কপাল লইয়া বাদ্য করিতেছেন। রাজা এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না; যথোপযুক্ত ভক্তিযোগসহকারে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, ভৃত্য উপস্থিত, আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।" যোগী আশীর্ব্বাদপ্রয়োগপূর্ব্বক সমীপ-পাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন, "এই আসনে উপবেশন কর।"

রাজা তদীয় আদেশ অনুসারে আসন পরিগ্রহ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, ভৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞা

হয়?" যোগী কহিলেন, "মহারাজ, তোমার বাক্যনিষ্ঠায় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, সৎপুরুষেরা প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যাহা হউক, যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছ, এক বিষয়ে আমার সাহায্য কর। দুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্মশান আছে, তথায় দেখিতে পাইবে, এক শিরীষ বৃক্ষে শব ঝুলিতেছে, ঐ শব আমার নিকটে লইয়া আইস।" রাজা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। এইরূপে রাজাকে শবানয়নে প্রেরণপূর্ব্বক যথাবিধি বিবিধ আয়োজন করিয়া সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন।

একে চতুর্দ্দশীর রাত্রি, সকলেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত, তাহাতে আবার ঘনঘটাদ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, আর ভূতপ্রেতগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়ের সঞ্চার হয়? কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রাজা নির্দ্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্ত্তি ভূতপ্রেতগণ জীবিত মনুষ্য ধরিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, কোনস্থলে ডাকিনীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চর্ব্বণ করিতেছে। রাজা ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্‌ধক্ করিয়া

জ্বলিতেছে ; আর চারিদিকে অনবরত কেবল মার্ মার্ কাট্ কাট্ ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও রাজা ভয় পাইলেন না। কিন্তু মনে মনে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যক্ষ যে যোগীর কথা কহিলেন, এ সেই ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর তিনি সেই বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, শব রজ্জুবদ্ধ, অধঃশিরাঃ লম্বমান রহিয়াছে। শবদর্শনে শ্রম সফল বোধ করিয়া রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক খড়্গাঘাত দ্বারা শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন। শব ভূতলে পতিত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা তদীয় কণ্ঠরব শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কে? কি নিমিত্ত তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, বল।" শব খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজা দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারের মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণে অশেষ প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে শব বৃক্ষে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ রজ্জুবদ্ধ ও লম্বমান হইয়া রহিল। রাজাও তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন পুরঃসর শবকে কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং নিরতিশয় নির্ব্বন্ধসহকারে তাহার এরূপ বিপৎপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে কিছুই উত্তর দিল না। রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'যক্ষের নিকট

যে তৈলিকের উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি ; আর যোগীও সেই কুম্ভকার, আপন যোগসিদ্ধির উদ্দেশে, ইহার প্রাণসংহার করিয়া, শ্মশানে রাখিয়াছে।' অনন্তর তিনি শবকে উত্তরীয়বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন।

৫

অর্দ্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, "অহে বীর পুরুষ, তুমি কে? আমায় কি নিমিত্ত কোথায় লইয়া যাইতেছ ; বল।" ভূপতি কহিলেন, "আমি রাজা বিক্রমাদিত্য ; শান্তশীল নামক যোগীর আদেশ অনুসারে তোমায় তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতেছি।"

বেতাল কহিল, "মহারাজ, আমি তোমার সাহস ও অধ্যবসায় দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় কিছু উপদেশ দিতেছি, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যে যোগী তোমাকে শবানয়নে নিযুক্ত করিয়াছে, সে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন ; তাহার নাম শান্তশীল। আর যে শব লইতে আসিয়াছ, উহা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ। শান্তশীল যোগসিদ্ধির নিমিত্ত অনেক কৌশলে চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া আছে ; এক্ষণে তোমার প্রাণসংহার করিতে পারিলেই উহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এজন্য আমি তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি, যোগী পূজা সমাপন করিয়া তোমায় বলিবে, 'মহারাজ, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর। তদনুসারে যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইবে, অমনই সে খড়্গপ্রহার দ্বারা তোমার প্রাণসংহার করিবে।

অতএব তুমি কোন ক্রমে সেরূপ প্রণাম না করিয়া বলিবে 'আমি কোনকালে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নাই এবং কেমন করিয়া সেরূপ প্রণাম করিতে হয়, তাহাও জানি না; আপনি কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিলে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি।' অনন্তর তোমায় দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত সে যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে, অমনি তুমি খড়গপ্রহারদ্বারা তাহার মস্তক-চ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার ও চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানলের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে এবং তাহা হইলেই তদীয় সম্পূর্ণ যোগফল প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে অবিচল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে। সে ব্যক্তি আততায়ী; আততায়ীর বধে পাতক নাই।

৬

এইরূপে বিক্রমাদিত্যকে সতর্ক করিয়া দিয়া বেতাল সেই মৃত শরীর হইতে বহির্নিঃসরণ পুরঃসর স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজা সেই শব লইয়া সন্ন্যাসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি সাতিশয় সন্তোষ প্রদর্শন ও রাজার অশেষ প্রকার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; অনন্তর চন্দ্রভানুর মৃতদেহে জীবনদানপূর্ব্বক বলি প্রদান করিলেন এবং পূজার অন্যান্য অঙ্গ যথাবৎ সমাপ্ত করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর; তোমার প্রতাপ বৃদ্ধি ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।" রাজা বেতালদত্ত উপদেশ অনুসারে কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিবিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে জানি না; আপনি গুরু;

কি প্রকারে ওরূপ প্রণাম করিতে হয়, কৃপা করিয়া দেখাইয়া দেউন!" যোগী রাজাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম শিখাইবার নিমিত্ত যেমন ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, অমনি রাজা বেতালের উপদেশ অনুসারে খড়গঘাতদ্বারা তাঁহার শিরচ্ছেদন করিলেন।

দেবতারা এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবরাজ দেবলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি তোমার সৌভাগ্য দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" রাজা অনিমিষ-সহস্র-নয়নে অলঙ্কৃত কলেবরদর্শনে দেবরাজ স্থির করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার প্রসাদে পৃথিবীতে আমার কোন প্রার্থয়িতব্য নাই। এখনে এইমাত্র প্রার্থনা করি যেন, আমার এই বৃত্তান্ত সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ হয়।" ইন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ, যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার এই বৃত্তান্ত ধরাতলে প্রসিদ্ধ থাকিবে।"

এইরূপে রাজাকে বরপ্রদান করিয়া দেবরাজ দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর রাজা মন্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক দুই মৃতদেহ তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবিদন করিল, "মহারাজ, কি আজ্ঞা হয়?" রাজা কহিলেন, "আমি যখন যখন স্মরণ করিব, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইবে।" তাহারা যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া প্রস্থান করিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও

সর্ব্বপ্রকারে চরিতার্থ হইয়া নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে রাজধানী প্রতিগমনপূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সংক্ষিপ্ত)।

শকুন্তলা।

[১]

অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট্ ছিলেন। তিনি একদা বহু সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি এক হরিণ-শিশুকে লক্ষ্য করিয়া শরাসনে শর-সন্ধান করিলেন। হরিণ-শিশু তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রাণভয়ে অতি দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, 'মৃগের পশ্চাৎ রথ চালন কর।' সারথি কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দূর হইতে দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।" সারথি শুনিয়া অবলোকন করিয়া কহিল, "মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন।" রাজা তপস্বীর নাম শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া

সারথিকে কহিলেন, "ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগ সংবরণ কর।" সারথি 'যে আজ্ঞা মহারাজ,' বলিয়া রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে তপস্বীরা রথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এ আশ্রমমৃগ বধ করিবেন না। আপনার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষেপ করিবার যোগ্য নহে। অতএব শরাসনে যে শরসন্ধান করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনার অস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।"

রাজা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শর প্রতিসংহার করিয়া প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা 'দীর্ঘায়ুরস্তু' বলিয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে। প্রার্থনা করি, আপনার পুত্রলাভ হউক এবং সেই পুত্র এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন।" রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।"

অনন্তর তাপসেরা কহিলেন, "মহারাজ! ঐ মালিনী নদীতীরে আমাদিগের গুরু মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে। যদি কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন, আর তপস্বীরা কেমন নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, আপনার ভুজবলে ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত

হইতেছে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "মহর্ষি আশ্রমে আছেন?" তপস্বীরা কহিলেন, "না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই, এইমাত্র স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভারপ্রদান করিয়া তদীয় দুর্দ্দৈবশান্তির নিমিত্ত সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন।" রাজা কহিলেন, 'মহর্ষি আশ্রমে নাই, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বে তদীয় তপোবন দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতেছি।" তখন তাপসেরা 'এক্ষণে আমরা চলিলাম', এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা সারথিকে কহিলেন, "সূত! রথ চালন কর, তপোবন দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব।" সারথি ভূপতির আদেশ পাইয়া পুনর্ব্বার রথচালন করিল। রাজা কিদ্দূরগমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ, কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবারসকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ, কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল নিঃশঙ্ক চিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে এবং যজ্ঞীয় ধূমসমাগমে নব-পল্লবসকল মলিন হইয়া গিয়াছে।" সারথি কহিল, "মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।"

রাজা কিঞ্চিৎ গমন করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; এই স্থানেই রথ স্থাপন কর, আমি অবতীর্ণ হইতেছি।" সারথি রশ্মি সংযত করিল।

রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সূত! তপোবনে বিনীতবেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য; অতএব শরাসন ও সমুদায় আভরণ রাখ।" এই বলিয়া রাজা সেই সমস্ত সূতহস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, "অশ্বগণের আজি অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব আশ্রমবাসী-দিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে তাহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও।" সারথিকে এই আদেশ দিয়া রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র রাজার দক্ষিণ-বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "এই আশ্রমপদ শান্তরসাস্পদ. অথচ আমার দক্ষিণ-বাহুর স্পন্দন হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে।

[২]

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নাম্নী দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, "সখি শকুন্তলে! বোধ করি, পিতা কণ্ব তোমা অপেক্ষাও আশ্রমপাদপ-দিগকে ভালবাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা, তথাপি তোমাকে আলবালজলসেচনে নিযুক্তা করিয়াছেন।"

শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন করিতে

আসিয়াছি,এমন নয়,আমারও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে।” প্রিয়ংবদা কহিলেন, “সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয়, তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, এস, তাহাদিগকেও সেচন করি।” এই বলিয়া সকলে মিলিয়া সেই বৃক্ষে জলসেচন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “সখি! দেখ দেখ, সমীরণ-ভরে সহকারতরুর নবপল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার অঙ্গুলি-সঙ্কেতদ্বারা আমাকে আহ্বান করিতেছে; অতএব আমি উহার নিকটে চলিলাম।” এই বলিয়া সেই সহকার তরুতলে গিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন, “সখি! ঐখানে খানিক থাক।” শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, “কেন সখি?” প্রিয়ংবদা কহিলেন, “তুমি সমীপ-বর্ত্তিনী হওয়াতে যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল।” শকুন্তলা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “সখি! এই নিমিত্তই তোমাকে প্রিয়ংবদা বলে।

অনসূয়া কহিলেন, “শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালি-কার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ, সে স্বয়ংবরা হইয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে।” শকুন্তলা শুনিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া সহর্ষ-মনে কহিতে লাগিলেন, “সখি অনসূয়ে, দেখ, ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত! নবমালিকা বিকসিত নব-কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে আর সহকারও ফলভরে অবনত

হইয়া রহিয়াছে।" উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে; ইত্যবসরে প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, "অনসূয়ে! কি নিমিত্ত শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক-নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান?" অনসূয়া কহিলেন, "না সখি! জানি না, কি বল দেখি?" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "এই মনে করিয়া যে, যেমন বনতোষিণী সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন তেমনই আপন অনুরূপ বর পাই।" শকুন্তলা কহিলেন, "ইটি তোমার আপনার মনের কথা!

শকুন্তলা এই বলিয়া অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হৃষ্টমনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, "সখি! তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দিই, মাধবীলতার মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত মুকুল নির্গত হইয়াছে।" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "সখি! আমিও তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দিই। তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে।" শকুন্তলা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিমকোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "এ তোমার মনগড়া কথা, আমি শুনিতে চাহি না।" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "না সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না, পিতার মুখে শুনিয়াছি, তাই কহিতেছি মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম, এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "প্রিয়ংবদে! এই নিমিত্তই শকুন্তলা মাধবীলতাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করে বটে!" শকুন্তলা কহিলেন, "সে জন্যে ত নয়; মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করি।"

এই বলিয়া শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচন আরম্ভ করিলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেক করিবামাত্র মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া বিকসিত কুসুম-ভ্রমে শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লব-সঞ্চালনদ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্‌গুন্ করিয়া অধর-সমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা একান্ত অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্ব্বৃত্ত মধুকর আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে।" তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি? দুষ্মন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।" ইতিমধ্যে ভ্রমর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে শকুন্তলা কহিলেন, "দেখ, এই দুর্ব্বৃত্ত কোন মতে নিবৃত্ত হইতেছে না! আমি এখান হইতে যাই।" এই বলিয়া দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন, "কি আপদ! এখানেও আবার আমার সঙ্গেসঙ্গে আসিতেছে। সখি! পরিত্রাণ কর।" তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার কহিলেন, "প্রিয় সখি! আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণ কর; তিনি তোমায় পরিত্রাণ করিবেন।"

[৩]

রাজা শুনিয়া সত্বরগমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিলেন, "পুরুবংশোদ্ভব দুষ্মন্ত দুর্ব্বৃত্তদিগের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে কার সাধ্য, মুগ্ধস্বভাবা তপস্বিকন্যাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করে?"

তপস্বিকন্যারা এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ কিছু সঙ্কুচিতা হইলেন; কিঞ্চিৎ পরেই অনসূয়া কহিলেন, "না মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্ট-ঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, এক দুষ্ট-মধুকর আমাদিগের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে অতিশয় আকুল করিয়াছিল, তাহাতেই ইনি কিছু কাতরা হইয়াছিলেন।" রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন, তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে?" শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতা ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। অনসূয়া শকুন্তলাকে উত্তরপ্রদানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া রাজাকে কহিলেন, "হাঁ মহাশয়! তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে অতিথিবিশেষলাভদ্বারা সবিশেষ বৃদ্ধি হইল।" প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখি! যাও যাও, শীঘ্র কুটীর হইতে অর্ঘ্যপত্র লইয়া আইস। জল আনিবার প্রয়োজন নাই, এই ঘটে যে জল আছে, তাহাতেই পাদপ্রক্ষালন সম্পন্ন হইবে।" রাজা কহিলেন, "না না, এত ব্যস্ত হইতে হইবে না; মধুরসম্ভাষণদ্বারাই আতিথ্য করা হইয়াছে।" তখন অনসূয়া কহিলেন, "মহাশয়! তবে এই সুশীতল সপ্তপর্ণবেদীতে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। রাজা কহিলেন, "তোমরাও জলসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, মুহূর্ত্ত বিশ্রাম কর। প্রিয়ংবদা কহিলেন, "সখি শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা উচিত; এস, আমরাও বসি। অনন্তর সকলেই উপবেশন করিলেন।

এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা তাপসকন্যাদিগের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তোমাদিগের সমান রূপ, সমান বয়স, সমান ব্যবসায় ; সেই নিমিত্ত তোমাদিগের সৌহৃদ্য অতি রমণীয় হইয়াছে।" প্রিয়ংবদা রাজার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন, "সখি! এ ব্যক্তি কে ? দেখেছ, কেমন চতুর, কেমন গম্ভীরাকৃতি ও কেমন প্রভাবশালী! মধুর আলাপদ্বারা যেন চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রতীতি জন্মাইতেছেন।" অনসূয়া কহিলেন, "সখি! আমারও এ বিষয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনার মধুর আলাপ শ্রবণে সাহসী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন ? কোন্ দেশকেই বা সম্প্রতি আপনার বিরহে কাতর করিতেছেন ? কি নিমিত্তই বা এরূপ সুকুমার হইয়াও তপোবন-দর্শন পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন ?"

রাজা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এখন কিরূপে আত্মপরিচয় দিই ? যথার্থ পরিচয় দিলে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়ে।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, "ঋষি-তনয়ে! আমি এই রাজ্যের ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত, পুণ্যাশ্রমদর্শন-প্রসঙ্গে এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি।" অনসূয়া কহিলেন, "অদ্য তপস্বীদিগের বড় সৌভাগ্য ; মহাশয়ের সমাগমে অদ্য তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করিবেন।"

শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, রাজা একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাদের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছা করি।" তাঁহারা কহিলেন, "মহাশয়! আপনার এ অভ্যর্থনা অনুগ্রহবিশেষ; যাহা ইচ্ছা হয়, অসঙ্কুচিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করুন।" রাজা কহিলেন, "মহর্ষি কণ্ব জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি কৌমারব্রহ্মচারী, ধর্ম্মচিন্তায় ও ব্রহ্মোপাসনায় একান্ত রত; অথচ তোমাদের সখী তাঁহার কন্যা, ইহা কিরূপে সম্ভবে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজার এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া অনসূয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমাদের প্রিয়সখী মেনকাগর্ভসম্ভূতা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কন্যা! নির্দ্দয়া মেনকা সদ্যঃপ্রসূতা তনয়াকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। আমাদের সখী বিজন বনে অনাথা পড়িয়া থাকেন। এক পক্ষী কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে স্নেহরসপরবশ হইয়া পক্ষপুটদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে পিতা কণ্ব পর্য্যটনক্রমে সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে তদবস্থায় পতিতা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনয়ন করিয়া স্বীয় তনয়ার ন্যায় পালন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমে শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী লালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত নাম 'শকুন্তলা' রাখিলেন।"

রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন "হাঁ, সম্ভব বটে; নতুবা মানবীতে কি এরূপ আলৌকিক রূপলাবণ্য সম্ভবিতে পারে? ভূতল হইতে কখন জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না।"

শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন "মহাশয় আকার ইঙ্গিত দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন।" শকুন্তলা রাজার অগোচরে প্রিয়ংবদাকে ভ্রূভঙ্গী ও অঙ্গুলীদ্বারা তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, "বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ; তোমাদের সখীর বিষয়ে আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "এত বিচার করিতেছেন কেন? যাহা ইচ্ছা হয়, অসঙ্কুচিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করুন।" রাজা কহিলেন, "আমার জিজ্ঞাস্য এই তোমাদের সখী যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ পর্য্যন্তমাত্র তাপসব্রত সেবা করিবেন, অথবা যাবজ্জীবন হরিণীগণের সহবাসেই কালযাপন করিবেন?" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "তাত কণ্ব সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন, অনুরূপ পাত্র না পাইলে শকুন্তলার বিবাহ দিবেন না।"

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "অনসূয়ে! আমি চলিলাম, আর আমি এখানে থাকিব না।" অনসূয়া কহিলেন, "সখী, কি নিমিত্তে?" শকুন্তলা বলিলেন, "দেখ, প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে, তাই কহিতেছে; আমি যাইয়া আর্য্যা গৌতমীকে কহিয়া দিব।" অনসূয়া কহিলেন, "সখি, অভ্যাগত মহাশয়ের এপর্য্যন্ত সৎকার করা হয় নাই। বিশেষতঃ আজি তোমার উপরে অতিথিসৎকারের ভার আছে। অতএব ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে।" শকুন্তলা কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদা

শকুন্তলাকে আটকাইয়া কহিলেন, "সখি! তুমি যাইতে পাইবে না। আমার দুই কলসী জল ধার; আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব।" এই বলিয়া শকুন্তলাকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। রাজা কহিলেন, "তাপসকন্যে! তোমার সখী বৃক্ষ-সেচনদ্বারা অতিশয় ক্লান্তা হইয়াছেন, আর উহাকে পল্বল হইতে জল আনাইয়া অধিক ক্লান্তা করা উচিত হয় না। আমি তোমার সখীকে ঋণমুক্তা করিতেছি।" এই বলিয়া অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া জলকলসের মূল্যস্বরূপ প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা অঙ্গুরীয়মুদ্রিত নামাক্ষর পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরমুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুরীয়ে যে দুষ্মন্তনাম মুদ্রিত ছিল, প্রদানকালে রাজার তাহা স্মরণ ছিল না। এক্ষণে আত্মপ্রকাশসম্ভাবনা দেখিয়া সাবধান হইয়া কহি-লেন, "আমি রাজপুরুষ, রাজা আমাকে প্রসাদচিহ্নস্বরূপ এই স্বানামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন।" প্রিয়ংবদা রাজার ছল বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহাশয়! তবে এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলি-বিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে; আপনার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্তা হইলেন।" পরে ঈষৎ হাসিয়া শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন "সখি শকুন্তলে! এই মহাশয়, অথবা মহারাজ তোমাকে ঋণমুক্তা করিলেন; এক্ষণে ইচ্ছা হয় যাও।" শকুন্তলা কহিলেন "আমি যাই না যাই তোমার কি?"

রাজার ও তাপসকন্যাদিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে, এমন

সময়ে সহসা অনতিদূরে কোলাহল হইতে লাগিল এবং কেহ কহিতে লাগিল, "হে তপস্বিগণ! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে তপোবনসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; তোমরা তপোবনস্থ প্রাণিসমূহের রক্ষণার্থ সত্বর ও যত্নবান্ হও। বিশেষতঃ এক আরণ্য গজ রাজার রথ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নস্বরূপ ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে।"

তাপসকন্যারা শুনিয়া সাতিশয় ব্যাকুলা হইলেন। রাজা বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "কি আপদ্! অনুযায়ী লোকেরা আমার অন্বেষণে আসিয়া তপোবনে পীড়া জন্মাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সত্বর গিয়া নিবারণ করিতে হইল।" অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন. "মহারাজ! আরণ্য গজের কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, অনুমতি করুন, কুটীরে যাই।" রাজা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কহিলেন, 'তোমরা কুটীরে যাও; আমিও তপোবনপীড়া পরিহারের চেষ্টা পাই।" অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন, "মহারাজ! যেন পুনরায় আমরা আপনার দর্শন পাই। আপনার সমুচিত অতিথিসৎকার করা হয় নাই, এজন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি।" রাজা কহিলেন, "না না, তোমাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট সৎকারলাভ হইয়াছে।"

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইল। পরিশেষে রাজা গন্ধর্ব্ব-বিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ সমাধানপূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

[৪]

কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, অগ্নিগৃহে হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"মহর্ষে! রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া শকুন্তলার প্রাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন ; শকুন্তলা এখন গর্ভবতী।" মহর্ষি এইরূপে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না ; বরং যৎ-পরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, শকুন্তলা এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগত হইয়াছে।" অনন্তর প্রফুল্ল-বদনে শকুন্তলার নিকটে গিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! তোমার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অদ্যই দুই শিষ্য ও গৌতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমাকে ভর্ত্তৃসন্নিধানে পাঠাইয়া দিতেছি।" অনন্তর তদীয় আদেশক্রমে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষা সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগি-লেন, "অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হই-তেছে, নয়ন অবিরত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠ রোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি।

কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে! বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু!" পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, "বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কাল হরণ করিতেছ কেন?" এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমতি কর।"

অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিতে লাগিলেন, "সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না।" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতরা হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইতেছে, দেখ। সচেতন জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহারবিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে, কোকিল-কোকিলাগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে,

মধুকর-মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে !”

কণ্ব কহিলেন, “বৎসে ! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয় ।” তখন শকুন্তলা কহিলেন, “তাত ! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না।” এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণী ! শাখাবাহুদ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর ; আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম ।” অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, “সখি ! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম।” তাঁহারা কহিলেন, “সখি ! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল ?” এই বলিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, “অনসূয়ে ! প্রিয়ংবদে ! তোমরা কি পাগল হইলে ? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হয়ে তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ?”

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল ; তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, “তাত ! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিতে ভুলিবে না বল ? কণ্ব কহিলেন, “না বৎসে ! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।”

কয়েকপদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন “বৎসে, যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায়

প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাকে আহরণ করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগদ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গমন-রোধ করিতেছে।” শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, “বাছা! আর আমার সঙ্গে এস কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম। অতঃপর পিতা তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন” এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, “বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ-নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।”

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থানেই যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন।” কণ্ব কহিলেন “তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই।” অনন্তর সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, “বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে, আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে

অনুরাগিনী হইয়াছে,এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় শকুন্তলাতে স্নেহদৃষ্টি রাখিবে, আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা'। ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবে; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।"

কণ্ব শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটি, কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবে না, স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না, মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপা।" ইহা কহিয়া বলিলেন, "দেখ, গৌতমী-ই বা কি বলেন?" গৌতমী কহিলেন, "বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবে?" পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, "বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।" এইরূপে উপদেশ-প্রদান সমাপ্ত হইলে কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, "বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না। আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।" শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, "অনসূয়া-প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক।" কণ্ব কহিলেন, "না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই;

অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না ; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাবেন।" শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া গদগদস্বরে কহিলেন, "তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব?" এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, বৎসে! এত কাতরা হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না।" শকুন্তলা পিতার চরণে পতিতা হইয়া কহিলেন, "তাত! আবার কত দিনে এই তপোবনে আসিব?" কণ্ব কহিলেন, বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া এই অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া পতি-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এই শান্তর সাস্পদ তপোবনে আসিবে।"

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গৌতমী কহিলেন, "বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার সময় বহিয়া যায়। সখীদিগকে যাহা কহিতে হয়, বলিয়া লও, আর বিলম্ব করা হয় না।" তখন শকুন্তলা সখীদিগের নিকট গিয়া কহিলেন, "সখি! তোমরা উভয়ে এককালে আলিঙ্গন কর।" উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, "সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনতে না পারেন, তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও।"

শকুন্তলা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল? আমার হৃৎকম্প হইতেছে।" সখীরা কহিলেন, "না সখি! ভীতা হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শকুন্তলা গৌতমী প্রভৃতির সমভিব্যাহারে দুষ্মন্ত-রাজধানী প্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এক দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূতা হইলে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; মহর্ষিও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন কর।" এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "যেমন স্থাপিত ধন ধনস্বামীকে প্রত্যার্পণ করিলে লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রূপ অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম।"

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সংক্ষিপ্ত)।

বিষবৃক্ষের ফলভোগ।

পথিপার্শ্বে।

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা-রাস্তার ঘুটীঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজনমাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারী বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দন-রেখা - জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস, ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ অপথ কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না—তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার-আলো, কুপথ-সুপথ সব সমান।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণা-বগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারে স্তূপ-স্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার

ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে! তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি—আবার মুহূর্ত্তজন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র তৈজস পথে

পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশে পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশু-সন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসংজ্ঞ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীরমধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই! ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আস্‌ছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদগ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটীকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণাযুক্ত। সময়-বিশেষে তাহার সৌন্দর্য্য ছিল-এমন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্রবস্ত্র অত্যন্ত মলিন ;—

এবং শত স্থানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, এখন সে চক্ষু নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন ?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপসেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত তাহাকে আর্দ্রবস্ত্রের পরিবর্ত্তে আপনার একখানি শুষ্কবস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক-বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু ক'রে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ!

হরমণির গরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে, সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা ?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল,—"আমি কোথা ?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে ?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেক দূর।"

হরমণি। "তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি কি সধবা?"

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গি করিল। হরিমণি অপ্রতিভ হইল।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?"

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

আশাপথে।

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইঁহার কাস রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাঙ্ঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

এ সকল কথা সূর্য্যমুখীর অসাক্ষাতে হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটি রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপিশাচ ছিলেন না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট বসিলেন। সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।"

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।

সূর্য্য। তবে আমাকে রাখিয়া আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে পারিবেন—আমার আপনি উপকার করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্ম। কেন?

সূর্য্য। বাঁচিলে আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কালরাত্রে যখন পথে পড়িয়াছিলাম—তখন নিতান্ত আশা করিয়াছিলাম যে, মরিব। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?

ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না, কিন্তু দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যা তুল্য পাপ।

সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এইজন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।

"মরণে আনন্দ নাই" এই কথা বলিতে সূর্য্যমুখীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যত বার মরিবার কথা হইল, তত বার তোমার চক্ষে জল পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে চাহ। মা, আমি তোমার সন্তানসদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া

মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখ নিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। এই কথা বলিব বলিয়াই হরমণিকে বিদায় দিয়া, নির্জ্জনে তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্রঘরের কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না? আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।"

সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "এখন মরিতে বসিয়াছি—লজ্জাই বা এ সময়ে কেন করিব? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়,—কেবল মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।"

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন, বলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি সংবাদ দিলে এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই।"

সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, 'তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি ততদিন বাঁচিব কি?"

ব্রহ্ম। কত দূরে সে ?

সূর্য্য। হরিপুর জেলা।

ব্রহ্ম। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম লইয়া আসিলেন এবং সূর্য্যমুখীর কথামত নিম্নলিখিতমত পত্র লিখিলেন।—

"আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আছি। আপনি কে তাহাও আমি জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে, শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী আপনার ভার্য্যা। তিনি এই মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সংবাদ দিবার জন্য আপনাকে এ পত্র লিখিলাম। তাঁহার মানস, মৃত্যুকালে একবার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে আসিবেন। আমি ইঁহাকে মাতৃসম্বোধন করি। পুত্রস্বরূপ তাঁহার অনুমতিক্রমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।

"যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমন্ মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

"আসিতে হয় ত, শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। ইতি শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা।"

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নামে শরোনামা দিব ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "হরমণি আসিলে বলিব।"

হরমণি আসিলে নগেন্দ্রনাথ দত্তের নামে শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী পত্রখানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

ব্রহ্মচারী যখন পত্র হাতে লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন সূর্য্যমুখী সজল-নয়নে, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়-মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়, আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না, কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে পৌঁছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীতে দরওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে, আমি যখন যেখানে পৌঁছিব, তখন সেইখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেইখানে আমার নামের পত্রগুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতিপূর্ব্বেই নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নৌকাপথে কাশীযাত্রা করিলাম। কাশী পৌঁছিলে পত্র লিখিব। আবার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।"

দেওয়ান এই সংবাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্সমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথাসময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্মাবগত হইয়া অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন, "জগদী-শ্বর! মুহূর্ত্ত-জন্য আমার চেতনা রাখ।" জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল; মুহূর্ত্তজন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল; কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জে যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

কর্ম্মাধ্যক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া, অচেতন হইলেন।

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাৎ করিলেন। ভুবনসুন্দরী বারাণসি! কোন্ সুখী জন এমন শারদ রাত্রে তৃপ্তলোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাহৃদয়ে তরীর উপর দাঁড়াইয়া যেদিকে চাও, সে দিকে আকাশে নক্ষত্র—অনন্ত তেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই! ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—নীলাম্বরবৎ স্থিরনীল তরণীহৃদয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায় সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ। এইরূপ আলোকরাজিশোভিত অনন্ত প্রাসাদশ্রেণী। আবার সমুদায় সেই

স্বচ্ছনদীনীরে প্রতিবিম্বিত—আকাশ, নগর, নদী—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময় দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুদিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তাঁহার আজি সহ্য হইল না। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পর পৌঁছিয়াছে—এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?

সূর্য্যমুখীর সংবাদ।

বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান-সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধূমাকার হয়। এমত সময়ে কার্ত্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে, খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ঝি-বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল—কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল—অবাক্ হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। বউগুলি ঘোমটার ভিতর হইতে চোক বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—আর আর স্ত্রীলোকেরা ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাষারা কার্ত্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাথায় পাগরী, হাঁ করিয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বর লোক অমনি কমিটিতে বসিয়া গেল। পাল্কীর ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির

হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জনে সেলাম করিল—কেন না,তাঁহার পেণ্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল। কেহ ভাবিল দারোগা; কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্র শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত জানিত—এখনই কোন খুনি মামলার সুরৎহাল হইবে—অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল "আজ্ঞে, আমি মশাই ছেলে মানুষ, আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্রনাথ তখন একজন বিশিষ্টলোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায় একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই। নগেন্দ্র বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা

আমরা জানি না। বিশেষ তিনি এক স্থানে স্থায়ী নহেন ; সর্ব্বদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র। কবে আসিবেন, তাহা কেহ জানে ?

রামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে ; এজন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ন হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন এখান হইতে গিয়াছেন ?"

রামকৃষ্ণ। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাদ্রমাসে গিয়াছেন।

নগেন্দ্র। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায়, আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন ?

রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল ; কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন ; ক্ষীণতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে ?"

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পলাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত ?"

রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, "না ; কেবল শ্রাবণমাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িতা হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রীলোকটি কাসরোগগ্রস্ত ছিল—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম—এমন সময়ে—"

নগেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে কি?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময়ে হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল।"

নগেন্দ্রনাথ চৌকী হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়! বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে! কে ভালবাসিতে চাহে?

এতদিনে সব ফুরাইল।

এতদিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, "আমার এত দিনে সব ফুরাইল।"

কি ফুরাইল? সুখ! তা ত যে দিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল

কি ? আশা। যত দিন মানুষের আশা থাকে, তত দিন কিছুই ফুরায় না, আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল !

নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। সেইজন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয়-আশয়ের বিলি-ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারী, ভদ্রাসনবাড়ী এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন, সে লেখাপড়া উকীলের বাড়ী নহিলে হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে* দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছু মাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর তিনি জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকটে পাঠাইবেন। বিষয়-আশয়ের আয়ব্যয়ের কাগজপত্র সকল শ্রীশচন্দ্রকে† বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর সূর্য্যমুখী যে ঘাটে শুইতেন, সেই ঘাটে শুইয়া একবার কাঁদিবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিবেন। সেগুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেইগুলি দেখিতে দেখিতে মরিবেন। এই সকল আবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার

---

* কমলমণি নগেন্দ্রনাথের ভগিনী।

† শ্রীশচন্দ্র কমলমণির স্বামী।

দেশ পর্য্যটন করিবেন। আর যত দিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোনও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিন যাপন করিবেন।

শিবিকারোহণে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চলিলেন। শিবিকাদ্বার মুক্ত, রাত্রি কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে তারা; বাতাসে রাজপথিপার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রে নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্টপদার্থমাত্রেই চক্ষুঃশূল বলিয়া বোধ হইল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে যে শোভাধারণ করিয়া মনোহর করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজি সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি শ্বেত, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল! পশুগণ তেমনি বিচরণ করিতেছে; মনুষ্য তেমনি হাস্যপরিহাসে রত, পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী; সংসারস্রোতঃ তেমনি অপ্রতিহত! জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না। কেন পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া নগেন্দ্রকে শিবিকাসমেত গ্রাস করিল না?

নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছেন, সে পরিমাণ প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন,

ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, মান এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় মাতা পিতা ত্রুটি করেন নাই—তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও ত প্রকৃতি তাঁহাকে অমিতহস্তে দিয়াছেন; ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারের অমূল্য –অশেষপ্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজি যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিলে, ধন সম্পদ্, মান, রূপ যৌবন, বিদ্যা বুদ্ধি সব দিলে তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতেন। বাহক কি? ভাবিলেন, "এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে যে, আমা অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হ'তে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত করিয়াছে, আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয়দমন করিলে সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীবধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমা অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়,

গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ! আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে যাইতেছেন, সূর্য্যমুখী পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্যশিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেইখানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিস্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিলেন।

তখন মনে করিলেন, "এ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, দাস-দাসী, বন্ধুবান্ধবের আর কোন সংস্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ক্লেশভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে যেখানে অনাথা

স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজব্যয়ার্থ রাখিলাম, সেই অর্থে আপনার প্রাণধারণমাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীন স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থ ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীন স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়, দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই! দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু! মরিলেই দুঃখ যায় সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?" তখন চক্ষু হস্তে আবৃত করিয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন।

সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না।

রাত্রি প্রহরেকের সময় শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে—পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তবাহিত কান্‌বাস ব্যাগ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ রাখিয়া নীরবে একখানা চেয়ারের উপরে বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে ক্লিষ্ট, মলিন-মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন; কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে কাশীতে নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়াছিলেন এবং পত্র পাইয়া মধুপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়া নগেন্দ্র কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া,

শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই ?"

নগেন্দ্র এই মাত্র বলিলেন, "গিয়াছিলাম।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই ?"

নগেন্দ্র। না।

শ্রীশ। সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাইলে ? – কোথায় তিনি ?

নগেন্দ্র ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে !"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।"

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পূর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না, বুঝিলেন যে, এখন মানেন। বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্য্যমুখী কোথাও নাই" এ কথা সহ্য হয় না- "সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন"–-এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়। তখন পরের কথা বিষবোধ হইবে। পরের সংসর্গ বিষ, এই বুঝিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের শয্যাদি করাইবার উদ্যোগে উঠিলেন। আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না ; মনে মনে করিলেন, সে ভার কমলকে দিবেন।

কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন

ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন।

কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আলুলায়িতকুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া দাসী সেইখানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া আসিল। সতীশচন্দ্র মাতাকে ধূলিধূসরা, নীরবে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া প্রথমে নীরবে নিকটে বসিয়া রহিল। পরে মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে যত্ন করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি সতীশের অঙ্গে হস্তপ্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, কথাও কহিলেন না। তখন সতীশ মাতারকণ্ঠে হস্ত দিয়া মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল। সে বালক-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বিধাতা ভিন্ন কে সে বালক-রোদনের কারণ নির্ণয় করিবে?

শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া আপনি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "উহার আবশ্যক নাই—কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"

তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সকল শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য। কেন না, গত কল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"

নগেন্দ্র। সে কি! তুমি ব্রহ্মচারীর সংবাদ কি প্রকারে পাইলে?

শ্রীশ। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুরে আসিয়াছিলেন, গোবিন্দপুরেও তোমায় পাইলেন না, কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পাইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার সন্ধানার্থ পুনশ্চ গোবিন্দপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সংবাদ পাইলেন না—শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সংবাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। পরশু আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কালি গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নগেন্দ্র। আমি কালি রাণীগঞ্জে ছিলাম না। সূর্য্যমুখীর কথা তিনি তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?

শ্রীশ। সে সকল কালি বলিব।

নগেন্দ্র। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেশবৃদ্ধি হইবে। এ ক্লেশের আর বৃদ্ধি নাই। তুমি বল।

তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্য্যমুখীর সঙ্গে পথে সাক্ষাতের কথা, পীড়ার কথা এবং চিকিৎসা ও অপেক্ষাকৃত আরোগ্যলাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন,—সূর্য্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সে সকল বলিলেন না।

শুনিয়া, নগেন্দ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র সঙ্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথে পথে নগেন্দ্র রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাগলের মত বেড়াইলেন। ইচ্ছা, জনস্রোত-মধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছিল—আর কি আত্মবিস্মৃতি লাভ করিতে পারেন? তখন পুনর্ব্বার শ্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বসিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছেন কি?"

শ্রীশ। আজ আর সে সকল কথায় কাজ কি? আজ শ্রান্ত আছ, বিশ্রাম কর।

নগেন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া মহাপরুষকণ্ঠে কহিলেন, "বল।" শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নগেন্দ্র পাগলের মত হইয়াছেন; বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের মত তাঁহার মুখ কালীময় হইয়াছে। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন "বলিতেছি।" নগেন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল। শ্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "গোবিন্দপুর-

হইতে সূর্য্যমুখী স্থলপথে অল্প অল্প করিয়া প্রথমে পদব্রজে এই দিকে আসিয়াছিলেন।”

নগেন্দ্র। প্রত্যহ কত পথ চলিতেন?

শ্রীশ। এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ।

নগেন্দ্র। তিনি ত একটী পয়সাও লইয়া বাড়ী হইতে যান নাই—দিনপাত হইত কিসে?

শ্রীশ। কোন দিন উপবাস, কোন দিন ভিক্ষা—তুমি পাগল!

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তাড়না করিলেন। কেন না, নগেন্দ্র আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠরোধ করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, “মরিলে কি সূর্য্যমুখীকে পাইবে?” এই বলিয়া নগেন্দ্রের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, “বল।”

শ্রীশ। তুমি স্থির হইয়া না শুনিলে আমি আর বলিব না।

কিন্তু শ্রীশ চন্দ্রের কথা আর নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগেন্দ্র মুদ্রিত-নয়নে স্বর্গরূঢ়া সূর্য্যমুখীর রূপ ধ্যান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তিনি রত্ন-সিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়াছেন; চারিদিক হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইতেছে; চারিদিকে পুষ্প-নির্ম্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; তাঁহার সিংহাসন-চন্দ্রাতপে শত চন্দ্র জ্বলিতেছে। চারিপার্শ্বে শত শত

নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে ; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।"

অনেক যত্নে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনাবিধান করিলেন। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সূর্য্যমুখী! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া নীরবে বসিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র স্বভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া বলিলেন, "বল"।

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, "আর কি বলিব।"

নগেন্দ্র : বল, নহিলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, সূর্য্যমুখী অধিক দিন এরূপ কষ্ট পান নাই। একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকাপথে আসিতেছিলেন। একদিন নদীকূলে সূর্য্যমুখী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর সহিত সূর্য্যমুখীর আলাপ হয়। সূর্য্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া এবং চরিত্রে প্রীতা হইয়া ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও কাশী যাইবেন।

নগেন্দ্র। সে ব্রাহ্মণের নাম কি? বাটী কোথায়?

নগেন্দ্র মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

শ্রীশ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থার ন্যায় সূর্য্যমুখী বর্হি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকায়, কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলক্-ট্রেণে গিয়াছিলেন; এ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া ক্লেশ পান নাই।

নগেন্দ্র। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদায় দিল ?

শ্রীশ। না, সূর্য্যমুখী আপনি বিদায় লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন না। কত দিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিবেন ? তোমাকে দেখিবার মানসে বর্হি হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।

কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষের জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল। তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া রোদন করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের বাটী আসিয়া এ পর্য্যন্ত নগেন্দ্র রোদন করেন নাই—তাঁহার শোক রোদনের অতীত। এখন রুদ্ধশোকপ্রবাহ বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশ-চন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। উহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল; যে শোকে রোদন নাই, সে যমের দূত।

নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এ সব কথায় আজ আবশ্যক নাই।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বলিবেই বা কি ? অবশিষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ত চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বর্হি হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পথ হাঁটিয়া

পরিশ্রমে, অনাহারে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, নিরাশ্রয়ে আর মনের ক্লেশে সূর্য্যমুখী রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে পড়িয়াছিলেন।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁহার অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্য অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁরই সকল দোষ, তিনি কেন বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই?

(৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

সংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গরীবের ঘরের দুটী মেয়ে।

বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে, সেই পথের অনতিদূরে একটী বড় পুষ্করিণী আছে। অনুমান শত বৎসর পূর্ব্বে কোন ধনবান্ জমিদার প্রজাদিগের হিতার্থ এবং আপনার কীর্ত্তিস্থাপনের জন্য সেই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন; সেকালে অনেক ধনবান্ লোকই এরূপ হিতকর কার্য্য করিতেন,তাহার নিদর্শন অদ্যাবধি বঙ্গদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চ পাড় ঘন তালগাছে বেষ্টিত, এত ঘন যে দিবাভাগেও পুষ্করিণীতে ছায়া পড়ে, সন্ধ্যার

সময় পুষ্করিণী প্রায় অন্ধকারপূর্ণ হয়। নিকটে কোনও বড় নগর নাই, কেবল একটী সামান্য পল্লী আছে, তাহাতে কয়েক ঘর কায়স্থ, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ ও দুই চারি ঘর কুমার, এক ঘর কামার ও কতকগুলি সদ্গোপ ও কৈবর্ত্ত বাস করে। একখানি মুদির দোকান আছে, তাহাতে গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্য দ্রব্যাদি যোগায় এবং তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটী হাট বসে, বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোক সেই হাটে যায়। পুষ্করিণীর নাম "তালপুকুর" এবং সেই নাম-হইতে গ্রামটীকেও লোকে তালপুকুর গ্রাম বলে।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের একজন নারী কলস লইয়া সেই পুকুরে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুইটী কন্যাও গিয়াছিল।

রমণীর বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, বড় কন্যাটীর বয়স ৯ বৎসর, ছোটটীর বয়স ৪ বৎসর হইবে।

সন্ধ্যার পর সে পুকুর বড় অন্ধকার হইয়াছে এবং সেই অন্ধকারে সেই ভীম বৃক্ষশ্রেণী আকাশে কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে ও সেই অন্ধকারময় তাল বৃক্ষগুলি সাঁই সাঁই করিয়া শব্দ করিতেছে, নির্জ্জনে সে শব্দ শুনিলে সহসা মন স্তম্ভিত হয়। পুকুরে আর কেহ নাই, রমণী ঘাটে নামিয়া কলসী নামাইলেন, মেয়ে দুটীও মার নিকটে দাঁড়াইল।

কলস নামাইয়া নারী একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন,

দিনের পরিশ্রমের পর এক বার বিশ্রামসূচক দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন। আকাশের অল্প আলোক সেই শ্রান্ত নয়নদ্বয়ে পতিত হইল, সন্ধ্যার বায়ু সেই পরিশ্রমে ক্লান্ত ঈষৎ স্বেদযুক্ত ললাট শীতল করিল এবং সেই চিন্তাঙ্কিত মুখহইতে দুই একটী চুলের গুচ্ছ উড়াইয়া দিল। নারী দিনের পরিশ্রমের পর এক বার আকাশের দিকে চাহিয়া সেই শীতল বায়ুস্পৃষ্ট হইয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন,

"মা বিন্দু, এক বার সুধাকে ধর ত, আমি একটা ডুব দিয়ে নি।"

বিন্দুবাসিনী। "মা আমি ডুব দেব।"

মাতা! না মা, এত সন্ধ্যার সময় কি ডুব দেয়, অসুখ কর্‌বে যে।"

বিন্দু। "না মা, অসুখ কর্‌বে না, আমি ডুব দেব।"

মাতা। "ছি মা, তুমি সেয়ানা হয়েছ, অমন করে কি বায়না করে? তুমি জলে নাম্‌লে আবার সুবা ডুব দিতে চাইবে, ওর আবার অসুখ কর্‌বে। সুধাকে একবার ধর, আমি এই এলুম বলে।"

মাতার কথা অনুসারে নবম বৎসরের বালিকা ছোট বোনটীকে কোলে করিয়া ঘাটে বসিল। সন্ধ্যাকালের অন্ধকার সেই ভগিনী-দু'টীকে বেষ্টন করিল, সন্ধ্যার সমীরণ সেই অনাথা দরিদ্রবালিকা-দু'টীকে সযত্নে সেবা করিতে লাগিল। জগতে তাহাদের যত্ন করিবার বড় কেহ ছিল না, মুখ তুলিয়া তাহাদের পানে চাহে, একটু মিষ্ট কথা বলিয়া একটু সান্ত্বনা করে, এরূপ লোক বড় কেহ ছিল না।

বিন্দুবাসিনীর মাতা কায়েস্তের মেয়ে, হরিদাস মল্লিকনামক একটী সমাবস্থার লোকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার ২০।২৫ বিঘা জমি ছিল, কিন্তু কায়স্থ বলিয়া আপনি চাষ করিতে পারিতেন না, লোকদিয়া চাষ করাইতেন, লোকের মাহিনা দিয়া, জমিদারের খাজানা দিয়া বড় কিছু থাকিত না ; যাহা থাকিত, তাহাতে ঘরের খরচের ভাতটা হইত মাত্র। অনেক কষ্ট করিয়া অন্য কিছু আয় করিয়া কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। তারিণীচরণ মল্লিকনামক তাঁহার একটী খুড়তুত ভাই বর্দ্ধমানে চাকরি করিতেন, কিন্তু এক্ষণে খুড়তুত ভাইয়ের নিকট সহায়তা প্রত্যাশা করা বৃথা, আপনার ভাইয়ের নিকট কদাচ সহায়তা পাওয়া যায়। তবে বিপদ্ আপদের সময় তাঁহাকে অনেক ধরিয়া পড়িলে ৫।১০ টাকা কর্জ্জ পাইতেন, শোধ করিতে পারিলে তিনি ভাই বলিয়া সুদটা ছাড়িয়া দিতেন। বিবাহের প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পরে তাঁহার একটী কন্যা হয়, এত দিনের পরের সন্তান বলিয়া বিন্দুবাসিনী মাতা পিতার বড় আদরের মেয়ে হইল। কিন্তু আদরে পেট ভরে না, বিন্দু গরিবের ঘরের মেয়ে, আদর ও মাতাপিতার ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু পাইল না। বিন্দুর বড় জ্যেঠা তারিণী বাবু যখন পূজার সময় বাটীতে আসিতেন তখন মেয়ের জন্য কেমন ঢাকাই কাপড়, কেমন হাতের নূতন রকমের সোনার চুড়ি, কেমন কানের কানবালা আনিতেন, বিন্দুর মা বাপ অনেক কষ্টে মেয়ের জন্য দু'গাছি অতি সরু সোনার বালা ও দুই পায়ে দুই গাছি রূপার মল গড়াইয়া দিলেন। বিন্দুর বাপের সেজন্য কিছু ধার হইল, অনেক কষ্টে

সে ধার শোধ করিতে পারিলেন না, একটী গরু বিক্রয় করিয়া তাহা পরিশোধ করিলেন। বিন্দু জ্যেঠাইমার মেয়ের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতে যাইত। বিন্দু ভালমানুষ, কখনও সে কাহাকে রাগ করিয়া কথা বলিত না, সুতরাং সেও বিন্দুকে ভাল-বাসিত, কখন কখন সন্দেশ খাইতে খাইতে একটু ভাঙ্গিয়া দিত, কখন মেলায় অনেক পুতুল কিনিলে একটী সোলার পুতুল দিত। বিন্দুর আনন্দের সীমা থাকিত না, বাড়ীতে আসিয়া কত হর্ষের সহিত মাকে দেখাইত; বিন্দুর মা বিন্দুকে চুম্বন করিতেন আর নিজের চক্ষের এক বিন্দু জল মোচন করিতেন।

বিন্দুর জন্মের পাঁচ বৎসর পরে তাহার একটী ভগিনী হইল। বড় মেয়েটী একটু কাল হইয়াছিল, ছোট মেয়ের রং পরীর মত, চক্ষু দু'টী কাল কাল ভ্রমরের ন্যায় সুন্দর ও চঞ্চল, মাথায় সুন্দর কাল চুল, লাল ঠোঁট্ দু'টীতে সদাই সুধার হাসি। গরিবের এ অমূল্য ধনকে গরিব বাপমা চুম্বন করিয়া তাহার সুধাহাসিনী নাম দিলেন। কিন্তু ভালবাসা ভিন্ন সুধার আর কিছু জুটিল না বরং দুইটী মেয়ে হওয়াতে বাপমার আরও কষ্ট বাড়িল। ছোট মেয়ের জন্য একটু দুধ চাই; এমন সুন্দর মেয়ের হাত দু'খানি খালি রাখা যায় না, দুই এক খানা গহনা হইলে ভাল হয়, পাড়াপড়শীর বাড়ী লইয়া যাইবার সময় এক খানি ঢাকাই কাপড় পরাইয়া লইয়া গেলে ভাল হয়। কিন্তু এ সব ইচ্ছা পূরণ হয় কোথা থেকে? বাপমার মনে কত সাধ হয়, কিন্তু উপায় কৈ? গরিব দুঃখীর আবার কিসের সাধ?

এইরূপে বিন্দুর পিতা অনেক কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, বিন্দুর মাতা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর সেবা ও কন্যাদু'টীকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া বাসন ধুইতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, উঠান পরিষ্কার করিতেন, কন্যাদু'টীকে খাওয়াইতেন, স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। স্বামীর ভোজনান্তে পুকুরে যাইয়া স্নান করিতেন ও জল আনিতেন। দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া কন্যাদু'টীকে লইয়া সেই সুন্দর বৃক্ষের ছায়ায় ভূমিতে কাপড় পাতিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেন। আবার বৈকাল বেলা পুনরায় রন্ধনাদি সংসারকার্য্য করিতেন। তথাপি এ সংসারে বিন্দুর মাতা অপেক্ষা কয়জন সুখী? লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গৃহস্থের মধ্যে বিন্দুর মাতা এক জন, তাঁহার কষ্ট থাকিলেও তিনি সদাশিবের ন্যায় স্বামী পাইয়াছিলেন, হৃদয়ের মণির ন্যায় দুইটী কন্যা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইলেও তিনি সেই শান্ত সংসারে কতকটা শান্তি ভোগ করিতেন, দরিদ্রা রমণী ইহা অপেক্ষা সুখ আশা করেন না।

কিন্তু তাঁহার এ সুখ ও শান্তি অধিক দিন রহিল না। দারুণ বিধির বিড়ম্বনা! সুধার জন্মের তিন বৎসর পরে হরিদাসের কাল হইল। হতভাগিনী সুধার মাতা তখন ললাটে করাঘাত করিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র পল্লী কাঁপাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভগবান্ কেন এ দরিদ্রের একটী ধন কাড়িয়া লইলেন—কেন এ হতভাগিনীর একটী সুখ হরণ করিলেন—এ

আঁধারে একটী দীপ নির্ব্বাণ করিলেন? বিধবার আর্ত্তনাদ শুনিয়া গ্রামের লোক জড় হইল, চাষা মজুরগণ সেই পথ দিয়া যাইবার সময় একটী অশ্রুবর্ষণ করিয়া গেল।

তাহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হরিদাসের যে জমি ছিল তাহা তারিণী বাবু এখন চাষ করান, বৎসরের শেষে হাত তুলিয়া যাহা দেন বিন্দুর মাতা তাহাই পান। তাহাতে উদরপূর্ত্তি হয় না, মেয়েদু'টীকে মানুষ করা হয় না, ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না, বৎসর বৎসর চাল ছাওয়া হয় না। বিন্দুর মাতা তখন সেই জীর্ণ কুটীর বিক্রয় করিয়া ভাশুরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সে বাড়ীর রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইত, তিনি বিন্দু ও সুধাকে ফেলিয়া বাড়ীর ছেলেদের কোলে করিয়া থাকিতেন, তাহাদের জল আনিতেন, বাসন মাজিতেন, ঘর ঝাঁট্ দিতেন। তাহা ভিন্ন আশ্রিত লোকের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর মাতা কটু কথার উত্তর দিতেন না, তিরস্কারে ক্ষুণ্ণ হইতেন না। কখন কখন তাঁহার মৃত স্বামীর নিন্দা করিলে বা পিতাকে নাম ধরিয়া গালি দিলে তিনি নীরবে পাকঘরে আসিয়া চক্ষুর জল মুছিতেন। ভাবিতেন "আহা! আমার বিন্দু ও সুধা মানুষ হউক, হে বিধাতঃ, তুমি ওদের কপালে সুখ লিখিও, আমার শরীরে সব সয়, আমি নিজের দুঃখ নিজের অপমান গ্রাহ্য করি না। আহা! যেন বিন্দু ও সুধাকে বিবাহ দিয়া উহাদের সুখী দেখিয়া মরি, তাহা হইলেই আমার সুখ।"

* *

রমণী ডুব দিয়া উঠিয়া, এক কলস জল কাঁকে লইয়া বলিলেন, "আয় মা বিন্দু ঘরে আয়, সুধাকে কোলে নে,আহা ! বাছার ননীর শরীর, এইটুকু এসে ক্লান্ত হইয়াছে। আহা ! বাছা যে ছেলে মানুষ, হাঁটতে পারবে কেন ? ওকি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ?"

বিন্দু। "হ্যাঁ মা ঘুমিয়ে পড়েছে, এই আমি কোলে করে নিয়ে যাই।"

মাতা। "না না, ঘুমিয়ে ভারি হয়েছে, আমার কোলে দে, তুই মা আমার আঁচল ধরে পথ দেখে দেখে আয়, বড় অন্ধকার হয়েছে, একটু একটু মেঘ হয়েছে,রাত্রিতে বোধ হয় জল হইয়াছে।"

বিন্দু। "না মা, আমিই কোলে নি, সে দিন ঘোষেদের বাড়ী থেকে রাত্রিতে সুধাকে কোলে করে এনেছিলাম, আর আজ এই ঘাটথেকে ঘরে নে যেতে পারবো না ? ঐত রান্না ঘরের আলো দেখা যায়।"

মাতা। "তবে নে বাছা, কিন্তু দেখিস্ মা, সাবধানে আসিস্, বড় অন্ধকার, যেন পড়ে যাস্‌নি। ঐ সেদিন তোর জ্যেঠাইমার মেয়ে উমাতারা রাত্রিবেলা মেলা থেকে আস্‌ছিল, পথে পড়ে গিয়াছিল, আহা, বাছার কপালটা এত খানি কেটে গিয়াছে।"

বিন্দু। "মা, উমাতারা কোন্ মেলায় গিয়াছিল ? কেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল এনেছিল; একটী কাঠের ঘোড়া এনেছিল, আর একটা মাটীর সিংহ এনেছিল, আর একটা কেমন কল এনেছিল, সেটা ঘোরে। সে সব কোথাথেকে এনেছিল মা ?"

মাতা। "তা জানিস্‌নি ? ঐ ওরা যে অগ্রদ্বীপের মেলায়

গিয়েছিল, সেখানে বছর বছর ভারি মেলা হয়, কত হাজার হাজার লোক যায়, কত বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, কত গান বাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।"

বিন্দু। "মা তুমি কখনও সেখানে গিয়াছিলে?"

মাতা! "গিয়েছিলাম বাছা, যখন আমি ছোট ছিলাম, এক বার আমার মা বাপ গিয়েছিলেন, আমরা বাড়ী শুদ্ধ গিয়েছিলাম, সেখানে তিন চারি দিন ছিলাম, একটা গাছতলায় বাসা করে ছিলাম।"

বিন্দু। "কেন ঘর ছিল না? গাছতলায় বাসা করেছিলে কেন মা?"

মাতা। "সেখানে কত হাজার হাজার লোক যায়, ঘর কোথায়? সকলেই গাছতলায় বাসা করে। একটা ভারি আম বাগান আছে, তাহার নীচে মেলা হয়, কত রাজ্যের দোকানী পসারী আসে, কত দেশের জিনিস বিক্রী হয়।"

বিন্দু। "মা, আমি একবার যাব, আমার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।"

মাতা। "আমার কি তেমন কপাল আছে মা যে তোকে নিয়ে যাব? কত টাকা খরচ হয়?

বিন্দু। "না মা, আমি আর বৎসর যাব! উমাতারা দেখেছে, আমি কেন যাব না?"

মাতা। "ছি মা, তুমি সেয়ানা মেয়ে, অমন করে কি বায়না করে? তোর জ্যেঠাইমারা বড়মানুষ, তাঁহার মেয়ে যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যায়। তোরা মা গরিবের ঘরের মেয়ে, তোদের

কি বাছা বায়না করলে সাজে? আহা, ভগবান্ যদি তোদের কপালে সুখ লিখিত, তাহা হইলে কি আর অন্নবস্ত্রের জন্য তোদের এমন লালায়িত হইতে হয়? তাহা হইলে কি আমার সোনার পুতুলেরা যেন পথের কাঙ্গালীর মত দ্বারে দ্বারে ফেরে? হা ভগবান্! তোমারই ইচ্ছা!"

চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছে, পশ্চিম দিকে কাল মেঘ উঠিয়াছে, আকাশ হইতে এক এক বার বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে, অন্ধকারময় বৃক্ষের পত্রের মধ্যদিয়া শব্দ করিয়া নিশার বায়ু বহিয়া যাইতেছে। গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল এক এক বার বৃক্ষের উপর হইতে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; অথবা দূর হইতে শৃগালের রব শুনা যাইতেছে। সমস্ত জগৎ অন্ধকার, কেবল মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটী হীনতেজ তারা এখনও দৃষ্ট হইতেছে, গ্রাম হইতে দুই একটী প্রদীপ বা চুলার আগুন দেখা যাইতেছে, আর এক এক বার অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে। সেই অন্ধকারে সেই বৃক্ষের নীচে গ্রাম্য পথ দিয়া বিন্দু মার আঁচল ধরিয়া নিঃশব্দে যাইতেছিল, যদি সে অন্ধকারে বিন্দু কিছু দেখিতে পাইত, তবে সে দেখিত মাতার চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে দুই একটি অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থলদিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই ভগিনী।

তালপুকুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারি দিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্র চাষ দিয়াছে, গরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই এক জন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগিনী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারিদিকে রাশিরাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম, কাঁটাল, তাল, নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলীবৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মনসা প্রভৃতি কাঁটাগাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য পথ পূরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বটগাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০।৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকার-পূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতরদিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষিগণ কুলায়ে নীরব হইয়া রহিয়াছে, কেবল কখন কখন দূর-

হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই আম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

সেই তালপুকুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁটাল প্রভৃতি দুই একটি ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার এক খানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫।৬টী নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটী মাচানের উপর লাউগাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। এক খানি বড় শুইবার ঘর আছে, তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটী রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটী গোয়াল ঘরে একটীমাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই এক খানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটা তক্তাপোষ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটী ডোবায় কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটী কুলগাছ, কয়েকটি কলাগাছ ও একটী আমগাছ, আর অনেক কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটি ছায়াপূর্ণ ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার; সেই অন্ধকারে

বাড়ীর গৃহিণী নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার একটী তিন বৎসরের কন্যা ভূমিতে মাদুরের উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটী ছয় মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী ধীরে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক এক বার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক এক বার গুন্ গুন্ শব্দে ঘুম পাড়াইবার ছড়া গাহিতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছেন।

নারীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর, শরীর ক্ষীণ, মুখখানি প্রশান্ত, কিন্তু একটু শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষুদু'টী বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল। অষ্টাদশ বৎসরের রমণীর যেরূপ বর্ণনা আমরা উপন্যাসে পাঠ করি তাহার কিছু ইহার নাই; সে প্রফুল্লতা, সে উদ্বেগ, সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নাই। উপন্যাস-বর্ণিত সুখ সকলের কপালে ঘটে না, উপন্যাস-বর্ণিত সৌন্দর্য্য সকলের থাকে না। এই বিশাল সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, দুই এক জন ঐশ্বর্য্যের সন্তানকে ছাড়িয়া দিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র গৃহস্থ ভদ্রলোকের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, আমাদিগের দরিদ্র ভগিনী বা কন্যা বা আত্মীয়গণ কিরূপে সুখে, দুঃখে, কষ্টে, সহিষ্ণুতায়, সংসারযাত্রা করেন চাহিয়া দেখ, দেখিয়া বল, ছার উপন্যাসের কাল্পনিক-অলীক সুখ কয় জনের কপালে ঘটিয়াছে, রূপার ঝিনুক ও গরম দুগ্ধমুখে করিয়া কয় জন এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষণেক বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল, মাতা নিদ্রিত শিশুকে সযত্নে মেজেতে মাদুরের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া

ক্ষণেক পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত ঈষৎ চিন্তাশীল ললাটের উপর পড়িয়াছে। স্থির প্রশান্ত, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়নদুইটী সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; নয়নে মাতার স্নেহ,মাতার যত্ন বিরাজ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার চিন্তা ও মাতার অসীম সহিষ্ণুতা লক্ষিত হইতেছে। শরীরখানি ক্ষীণ, কিন্তু সুগঠিত। ক্ষীণ সুগঠিত বাহু-দ্বারা নারী ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরে বসিয়া তাহার কত চিন্তা উদয় হইতেছিল। সংসারের চিন্তা, এই সুখ দুঃখ পূর্ণ জগতের চিন্তা, আর কখন কখন পূর্ব্বকালের চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে ধীরে সেই রমণীর হৃদয়ে উদয় হইতেছিল।

ছেলে বেশ ঘুমাইয়াছে। তখন মাতা পাখাখানি রাখিয়া আপন বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া ছেলের পাশে মাটীতে শুইলেন, নয়ন দুইটী ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, তিনি অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সে ঘরটীও নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় সন্তানদু'টীর পার্শ্বে স্নেহময়ী মাতা নিদ্রিত হইলেন। সংসারের অশেষ ভাবনা ক্ষণেক তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল, সেই শান্ত. সহিষ্ণু. চিন্তাশীল মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে চিন্তার দুইটী রেখা অপনীত হইল। রমণী দুই তিন দণ্ড এইরূপ নিদ্রিত রহিলেন। পরে একটু শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তখন তাহার পার্শ্বে একটী প্রফুল্ল-নয়না, হাস্য-বদনা, সৌন্দর্য্য-বিভূষিতা বালিকা

বসিয়া একটী বিড়ালশিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে, তাহারই শব্দ। বিড়ালশিশু লাফাইয়া লাফাইয়া বালিকার হস্তের খেলিবার দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, বালিকা হস্ত টানিয়া লইতেছে। সে সুন্দর গৌরবর্ণ চিন্তাশূন্য ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ চুল পড়িতেছে, সড়িয়া যাইতেছে, আবার পড়িতেছে; সেই প্রফুল্ল, অতি উজ্জ্বল,কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দু'টী যেন উল্লাসে হাসিতেছে,সে বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠ দুইটী হইতে যেন সুধা ক্ষরিয়া পড়িতেছে, সেই সুগঠিত সুন্দর ললিত বাহুলতা বায়ু সঞ্চলিত লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু তাহার প্রফুল্ল মুখখানি ও হাস্যবিস্ফারিত নয়নদ্বয়, তাহার চিন্তাশূন্য মন ও উদ্বেগশূন্য হৃদয় বালিকারই বটে, নারীর নহে!

রমণী অনেকক্ষণ সেই প্রেমের পুত্তলির দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই বালিকা ও বিড়াল-শিশুর খেলা ক্ষণেক দেখিতে লাগিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন।

"সুধা, তুমি কতক্ষণ এসেছ ?"

সুধা। "দিদি, আমি অনেক ক্ষণ এসেছি, তুমি ঘুমচ্ছিলে তাই জাগাইনি। আর দেখ দিদি, এই বেড়াল ছানাটা আমি যেখানে যাব, সেই খানেই যাবে, আমি রান্নাঘরে বন্ধ করে বাসন মাজ্‌তে গেলুম ও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল।"

বিন্দু। "বাসন মাজা হয়েছে? বাসনগুলি সব ঘরে বন্ধ করে রেখে এসেছ ত ?"

সুধা। "হাঁ, সব মেজে রেখে এসেছি। তারপর বেড়ালকে

গোয়াল ঘরে বন্ধ করে এলুম, সে আবার সেখান থেকে বেড়া গ'লে এখানে এসেছে। ও আমার এই পুতুলটা নিতে চায় তা আমি দিচ্চি এই যে।"

বিন্দু। "তা বোন এত ক্ষণ এসেছ, এক বার শোও না, গেল রাত্রিতে তোমার ভাল ঘুম হয় নি, একটু ঘুমও না।"

সুধা। "না দিদি, আমার দিনে ঘুম হয় না, আমি রাত্রিতে বেশ ঘুমিয়েছিলেম। কেবল এক বার খোকা যখন কেঁদেছিল তখন আমার ঘুম ভেঙ্গেছিল। আজ খোকা কেমন আছে দিদি ?"

বিন্দু। "এখন ত আছে ভাল, রাত্রি হইলেই গা তপ্ত হয়। তা আজ তিনি কাটোয়া থেকে একটা ঔষধ আন্‌বেন বলেছেন, তাতে একটু ঘুমও হবে, জ্বরও আসবে না।"

সুধা। "হেমচন্দ্র কখন্ আস্‌বেন্ দিদি ?"

বিন্দু। "বলেছেন ত সন্ধ্যার সময় আস্‌বেন, কেন ?"

সুধা। "তিনি এলে একটা মজা কর্‌ব, তা দিদি তোমাকে বল্‌ব না, তিনি এলে দেখ্‌তে পাবে। যেমন আমার গায়ে সে দিন ফাগ দিয়াছিলেন।"

বিন্দু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কর্‌বি বল না ?"

সুধা। "না দিদি তুমি বলে দেবে।"

বিন্দু। "না, বল্‌ব না ?"

সুধা। "সত্যি বল্‌বে না ?"

বিন্দু। "সত্যি বল্‌ব না।"

তখন সুধা আপন আঁচলে বাঁধা একটা জিনিস বাহির করিল। জিনিসটা প্রায় এক হস্ত দীর্ঘ।

বিন্দু। "ওকি লো? ওটা কি?"

সুধা। "দেখতে পাচ্চো না?"

বিন্দু। "দেখছি ত, এ কি পাট?"

সুধা। "হাঁ পাট, কিন্তু কেমন কুসুম ফুল দিয়ে রং করেছি।"

বিন্দু। "কেন, ওতে কি হবে?"

সুধা। "বল দিকি কি হবে?"

বিন্দু। "কি জানি?"

সুধা। "এইটে ঠাওরাতে পার্‌লে না! যখন আজ রাত্রিতে হেমচন্দ্র একটু ঘুমবেন, আমি এইটে তাঁর দাড়িতে বেঁধে দেব, তার পর উঠলে তাঁকে জটা-ধারা সন্ন্যাসী বলে ঠাট্টা কর্‌ব! খুব মজা হবে।" এই বলিয়া বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

বিন্দু একটু হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সস্নেহে ভগিনীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন "সুধা, তোর সুধার হাসিতে এ জগৎ মিষ্ট হয়। আহা! বালিকা এখন তাহার ভাঙ্গা কপালে কি হয়েছে জেনেও জানে না। নিদারুণ বিধি! কেমন ক'রে এই কচি মেয়ের কপালে এ ভীষণ যাতনা লিখিলে—কেমন করে এ প্রফুল্ল সুধাপাত্রে গরল মিশাইলে?"

বলা অনাবশ্যক যে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহার নয় বৎসরের পরের কথা।

বলিতেছি। এই নয় বৎসরের ঘটনাগুলি কতক কতক উপরেই প্রকাশ হইয়াছে, আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

বিন্দুর মাতা আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া কষ্টে ও শোকে দুইটি অনাথা কন্যাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর এ সংসারে তিনি আর কোনও সুখের আশা রাখেন নাই, কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, মরিবার পূর্ব্বে দুইটি মেয়ের বিবাহ দিয়া যান। সে দিন তিনি দুইটী কন্যাকে লইয়া তালপুকুরে গিয়াছিলেন, তখন বিন্দুর বয়সও নয় বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মাতা বিবাহের পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গরিবের ঘরের মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হয় না। কলিকাতার বরের পিতা যেরূপ রাশি রাশি অর্থ চাহেন, পল্লীগ্রামে এখনও সেরূপ হয় নাই, কিন্তু তথাপি বড় ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করা সকলেরই সাধ, আত্মীয়ের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া যিনি কন্যাকে লালনপালন করিতেছেন, তাহার মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে সকলের সাধ হয় না। আত্মীয়েরাও এ বিষয়ে বড় মনোযোগ করিলেন না। কন্যাও গৌরবর্ণা ছিল না, তবে মুখে শ্রী ছিল, চক্ষু দু'টী সুন্দর ছিল, শরীর সুগঠিত ছিল, কিন্তু ক্ষীণ। সম্বন্ধ আসিতে লাগিল ও একে একে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

মেয়ের জ্যেঠাই মা রকের উপর দুই পা মেলাইয়া বসিয়া বৈকাল বেলা কেশবিন্যাস করিতে করিতে সহাস্যে বিন্দুর মাকে বলিলেন (বিন্দুর মা চুলের দড়ি ধরিয়াছিলেন) "তা ভাবনা কি বোন, আমাদের বাড়ীর মেয়ের বের জন্য ভাব্‌তে হয় না, আমাদের কুল,

মান, বর্দ্ধমানে ভারি চাকরী, এ কে না জানে বল, কত তপিস্যে করলে তবে লোকে এমন বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবনা ? এই রসো না, তিনি পূজার সময়ে বাড়ী আসুন, আমি বিন্দুর এমন সম্বন্ধ ক'রে দেব যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি করছে, বে দিলেই এখনি মাথায় ক'রে নিয়ে যায়, তা আমি গা করিনি। আমার উমাতারার এমন সম্বন্ধ করবো যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। তবে আমার উমাতারার বর্ণের জেল্লা আছে, তোমার মেয়ে একটু কালো, আর তোমাদের বোন তেমন টাকা কড়ি নাই। আমার দেওর তেমন সেয়ানা ছিল না, কিছু রেখে যায় নি, তাই যা বল। তা ভেব না বোন, আমি যখন এবিষয়ে হাত দিয়েছি, তখন আর কোন ভাবনা নেই!" আশ্বাসবচন শুনিয়া ও সেই সুন্দর তাবিজ-বিভূষিত বাহুর ঘন ঘন সঞ্চালন দেখিয়া বিন্দুর মা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু জ্যেঠাইমার বাহু নাড়াতে বিন্দুর বিশেষ উপকার হইল না, বিন্দুর বিবাহ হইল না।

তার পর পূজার সময় তারিণীবাবু বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহিণীর জন্য পূজার কাপড়, পূজার গহনা, পূজার সামগ্রী কতই আসিল, গৃহিণীও আহ্লাদে আটখানা! বাড়ীর ছেলেদের জন্য কত পোষাক, কাপড়, জুতা, উমাতারার জন্য ঢাকাই কাপড়, মাথার ফুল ইত্যাদি। নাজির মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন, গ্রামে ধূম পড়িয়া গেল, কত লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিল, কত খোসামোদ

কত সুখ্যাতি, কত আরাধনা! কাহারও পূজার সময় দুই পাঁচ টাকা কর্জ্জ চাই, কাহারও বিপদে সৎপরামর্শ চাই, কাহারও ছেলের একটী চাকরি চাই, আর কাহারও বিশেষ কিছু আপাততঃ চাই না, কেবল বড় লোকের খোসামোদটা অভ্যাস মাত্র, সেই অভ্যাসেই সুখ হয়। এত ধূমধামের মধ্যে, বিন্দুর কথা কেই বা বলে, কেই বা শোনে। ৵৫ দিনের ছুটী ফুরাইয়া গেল, নাজির মহাশয় আবার বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন, বিন্দুর সম্বন্ধে কিছুই স্থির হইল না।

পড়সীর মেয়েদের সঙ্গে যখন বিন্দুর মা দেখা করিতে যাইতেন, বৃদ্ধাদিগকে কত স্তুতি করিয়া কন্যার একটী সম্বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেন। তাঁহারাও আগ্রহচিত্তে বলিতেন, "তা দেব বৈ কি, তোমার দেব না তা কার দেব? তবে কি জান বাছা, আজ কাল মেয়ের বে সহজ কথা নয়। আর তুমি ত কিছু দিতে থুতে পারবে না, বিন্দুর বাপ ত কিছু রেখে যায়নি, তেমন গোছান লোক হতো, ঐ তোমার ভাশুরের মত টাকা কর্‌তে পার্‌ত, তবে আর কি ভাবনা থাক্‌ত? সেই সময় আমি কত বলেছিলুম, তা তখন সে গা কর্‌ত না, তোমরাও গা কর্‌তে না, এখন টের পাচ্ছ; গরিবের কথাটা বাসি হলেই ভাল লাগে! তা দেব বৈ কি বাছা, তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করে দেব এ বড় কথা?" অথবা অন্য একজন বৃদ্ধা বলিলেন, "তার ভাবনা কি? বিন্দুর বের আবার ভাবনা কি? তবে একটা কথা কিঁ জান, বিন্দু দেখতে শুনতে একটু ভাল হত, তবে এ কাজটা শীঘ্র শীঘ্র হত। তা মেয়ের মুখের ছিরি আছে,

তবে রংটা বড় কালো, আর চোখ দুটো বড় ডেবডেবে, আর মাথায় বড় চুল নাই। না, তা মেয়ের ছিরি আছে, তবে একটু কাহিল, হাড়গুল যেন জির জির কর্‌ছে, হাতপাগুল কেমন লম্বা লম্বা, আর এর মধ্যে ঢেঙ্গা হয়ে উঠেছে। তা হোক তুমি ভেবো না, কালো মেয়ে কি আর বিকোয় না, তবে কি আট্‌কে থাকে, তা থাক্‌বে না, যখন আমরা আছি তখন কিছু আট্‌কাবে না।" এইরূপে বৃদ্ধাদিগের যথেষ্ট আশ্বাস-বাক্য ও তাহার সঙ্গে বিন্দুর বাপের নিন্দা, বিন্দুর মার নিন্দা ও বিন্দুর নিন্দাসম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশ্বস্ত ও আপ্যায়িত হইয়া বিন্দুর মা বাড়ী আসিতেন।

গ্রামের মধ্যে দুই এক জন প্রাচীন লোক ছিলেন। তাঁহারা অনেক লোক দেখিয়াছেন, অনেক গ্রামে যাতায়াত করেন, অনেক ঘর জানেন, অনেক মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিন্দুর মা কয়েক দিন তাঁহাদের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিলেন। কোন দিন ছেলেদের জন্য দুই চারি পয়সার চিনির বাতাসা লইয়া গেলেন, কখন বা কিছু মিছরি বা মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া গৃহিণীদিগের মনস্তুষ্টি করিলেন, গৃহিণীদিগকে অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, তাঁহারাও আশ্বাসে-বাক্য দিলেন, সন্ধান করিবেন, কর্ত্তাকে বলিবেন, এইরূপ অনেক মধুর বচন বলিলেন। অবশেষে বিন্দুর মা ঘোমটা দিয়া সেই কর্ত্তাদিগেরই মিনতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে দেখা হইলে গরিবের কথাটি মনে রাখিবার জন্য মিনতি করিলেন, তাঁহারাও বলিলেন, "তা এ কথা আমাদের এত দিন বলনি?

এ সব কাজ কি আমাদের না বলিলে হয়, ঐ ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর কালীতারার বের জন্য কত হাঁটাহাঁটি করেছিল, শেষে বড় বৌ একদিন আমাকে ডেকে বল্‌লেন, অমনি কাজটা হয়ে গেল! কেমন বে দিয়ে দিয়েছি, রায়েদের বনিয়াদি ঘর, খাবার অভাব নেই, টাকার অভাব নেই, যেন কুবেরের ঘর, সেই ঘরের ছেলের সঙ্গে ঘোষেদের মেয়ের বের সম্বন্ধ করে দিলেম। ছেলেটী দোজবরে বটে আর একটু কাহিল ও একটু বয়স নাকি হয়েছে, তা এখনও চল্লিশের বড় বেশী হয়নি, আর কালীতারা আট বৎসরের হলেও দেখতে বাড়ন্ত, গ্রাম শুদ্ধ এ সম্বন্ধের সুখ্যাতি করছে। ছেলেটী বর্দ্ধমানে থাকে, লেখাপড়া না জানুক তার মান কত, যশ কত, সাহেবদের খানা দেয়, মজলিশ লোকে ভরা, গাড়ী ঘোড়া, লোকজন, বাবুয়ানা দেখলে লোকে বলে হাঁ জমিদারের ঘরের ছেলে বটে! তা আমরা হাত না দিলে কি এমন সম্বন্ধ হয়? তুমি মা এত দিন কোথা হাঁটাহাঁটি কর্‌ছিলে, আমাদের এক বার জিজ্ঞাসাও কর না, এখন যে যার আপন আপন প্রভু হয়েছে তাতে কি কাজ চলে? তা আজ আমাকে মনে পড়েছে তবু ভাল।" সজলনয়নে বিন্দুর মা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন এবং এমন লোকের নিকট পূর্ব্বে না আসা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে ভাবিলেন। অশ্রুজল ও মিনতিতে তুষ্ট হইয়া গ্রামের মণ্ডল বলিলেন, "তা ভেব না মা, এখন আমাকে যখন বললে তখন আর ভাবনা নেই, দুই চারি দিনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করে দিচ্ছি। বিন্দুর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন,

অনেক আশা করিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই চারি দিন অতীত হইল, দুই চারি মাস অতীত হইল, বিন্দুর সম্বন্ধ হইল না, গরিবের মেয়ে তরিল না।

বিন্দুর মা দেখিলেন তালপুকুরের লোক অনেক সদ্‌গুণবিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন; পরের বৌ ঝি কি করিতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রাখেন; ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্য নিঃস্বার্থ যত্ন করেন; কেহ বিপদে পড়িলে বা দায়ে ঠেকিলে তাহাকে পূর্ব্ব দোষের জন্য বিশেষরূপে নীতিগর্ভ তিরস্কার দেন, নৈতিক উপদেশ দেন এবং নিঃস্বার্থরূপে তাহাকে আশ্বাস দিতে, পরামর্শ দিতে যত্ন বা বাক্য ব্যয়ে ক্রুটী করেন না; তবে কাজের সময় সহায়তা করা—সে স্বতন্ত্র কথা! বিন্দুর মাতাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ হস্তপ্রসারণ করিলেন না, তাঁহার যাচ্ঞায় কেহ একটী কপর্দ্দকও দিলেন না, তাঁহার উপকারার্থ কেহ বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাড়িলেন না। বিন্দুর মা যদি কখনও তালপুকুর হইতে বাহিরে যাইতেন, তবে দেখিতেন এ সদ্‌গুণগুলি জগতের অন্যান্য স্থানেও লক্ষিত হয়। তবে বিন্দুর মাতা নির্ব্বোধ, এক এক বার তাঁহার মনে এরূপ উদয় হইত যে এ প্রচুর অশ্বাস-বাক্য ও সৎপরামর্শের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এই সামান্য দায় হইতে কেহ উদ্ধার করিয়া দিলে তাঁহার নৈতিক উন্নতি না হউক, সাংসারিক সুখ কতক পরিমাণে হইত।

তালপুকুর গ্রামে হরিদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হেমচন্দ্রনামক একটী পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্রকে অনেক যত্নে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং হেমচন্দ্রও যত্নসহকারে পাঠ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রথম পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কয়েক মাসের পরই পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয়া তালপুকুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র বসু বিন্দুর মা ও বিন্দুকে বাল্যকাল অবধি জানিতেন। তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি কিছু অল্প থাকা বশতঃই হউক, অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিস্ময়কর বিদ্যা কয়েক মাসাবধি শিখিয়াই হউক অথবা কলিকাতার বাতাস পাইয়াই হউক, তিনি পিতার পরম বন্ধু হরিদাসের দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত গ্রাম এ মূঢ়ের ন্যায় কার্য্যে চমকিত হইল, হেমচন্দ্রের বংশের পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিয়া পিতার নাম ডুবাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ছেলেটী কিছু গোঁয়ার, তিনি বিন্দুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তৎপরে বিন্দুর মাতাকে ও জ্যেঠাইমাকে সম্মত করাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। বিন্দুর জ্যেঠাইমা মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সরল, কলহ বা তিরস্কার করা তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না, তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহিতেন না। তবে বড়

মানুষের মেয়ে, স্বামী অনেক রোজগার করেন, তাহাতে যদি একটু বড়মানুষী রকম দর্প থাকে, একটু বড় কুটুম করিবার ইচ্ছা থাকে, দরিদ্রের সহিত যদি সহানুভূতি একটু কম থাকে, তাহা মার্জ্জনীয়। দুই একটী দোষ অনুসন্ধান করিয়া আমরা যেন নিন্দাপরায়ণ না হই, আমাদের মধ্যে কাহার সেরূপ দুই একটী দোষ নাই ?

বিন্দুর সরলস্বভাব জ্যেঠাইমা বিন্দুর বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করেন নাই, কাহারও জন্য বিশেষ যত্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু বিন্দুর একটী সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি প্রকৃতই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি শুভ দিন দেখিয়া হেমচন্দ্রের সহিত বিন্দুর বিবাহ দিলেন এবং পাড়াপড়সী মেয়েরা যখন বাটীতে আসিল,তখন সেই তাবিজ-বিভূষিত বাহু সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আহা আমার উমাতারাও যে বিন্দুও সে! আমি বিন্দুর বিবাহ না দিলে কে দেয় বল, বিন্দুর মার ত ঐ দশা, বাপও সিকি পয়সা রেখে যায় নি, আমি না করিলে কে করে বল।" ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়সীগণও, "তুমি ব'লে কর্‌লে, নৈলে কি অন্যে এতটা করে" এইরূপ অনেক যশোগান ও নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করিয়া ঘরে গেল।

তখন সুধার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র,কিন্তু সুধার মার বড় ইচ্ছা সুধারও বিবাহ দিয়া যান। হেমচন্দ্র অনেক আপত্তি করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, সুধাকে আপন ঘরে রাখিয়া একটু বাঙ্গালা শিখাইয়া পরে ১০।১২ বৎসরের সময় নিজব্যয়ে বিবাহ

দিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু সুধার মা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন "বাছা সুধার বিয়ে না দিয়া যদি মরি তবে আমার জীবনের সাধ মিট্‌বে না." হেমচন্দ্র কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া সুধাকে একটী সামান্য অবস্থার শিক্ষিত যুবার সহিত বিবাহ দিলেন।

বিন্দুর মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর তখন প্রথমে আপনাকে একটু সুখী মনে করিলেন। দুই বিবাহিতা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনাকে জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী মনে করিলেন। তিনি তখনও তারিণী বাবুর বাটীতে রহিলেন। সুধার বিবাহের কয়েক মাস পরেই তিনি জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন।

আর একটী কথা আমাদের বলিবার আছে। পঞ্চম বৎসরের সুধা বিবাহিতা স্ত্রী হইল, সপ্তম বৎসরে বিধবা হইল। সুধা স্ত্রী কাহাকে বলে জানে না, বিধবা কাহাকে বলে তাহাও জানে না! জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাটীতে আসিয়া সাত বৎসরের প্রফুল্ল বালিকা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া আনন্দে পুতুল খেলা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের কথা।

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হইয়াছে। চন্দ্রের নির্ম্মল শীতল কিরণে সুন্দর তালপুকুর গ্রাম সুপ্ত রহিয়াছে। বড় বড় তালবৃক্ষসার আকাশপটে অন্ধকারময় ও বিস্ময়কর ছবির ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামের চারি দিকে প্রচুর ও সুন্দর বাঁশঝাড়ের সুচিক্কণ পত্রের উপর সুপ্ত চন্দ্রকিরণ রহিয়াছে, পুষ্করিণীর ঈষৎ কম্পমান জলের উপর চন্দ্রালোক সুন্দর খেলা করিতেছে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরে ও তৃণাচ্ছাদিত ঘরের চালের উপর সেই সুন্দর আলোক যেন রূপার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। সমস্ত সুপ্ত গ্রামের উপর চাঁদের আলোক যেন যুঁই ফুলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থগণ অনেকেই খাওয়া দাওয়া করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, কেবল কোথাও কোথাও কোন নিদ্রাহীন বৃদ্ধ বাহিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া এখনও ধূম পান করিতেছেন, আর কোথাও বা অল্পবয়স্কা গৃহস্থবধূ এখনও বাটীর পার্শ্বের পুকুরে বাসন মাজিতেছেন, সংসারের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। নৈশ বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, আর দূর হইতে কোন প্রফুল্লমনা কৃষকের গান সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে শুনা যাইতেছে।

বিন্দু সংসারকার্য্য শেষ করিয়া এখনও স্বামী আসেন নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন মনে শুইবার ঘরের রকে বসিয়া রহিয়াছেন, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ শুভ্র বসন ও শান্ত নয়নের উপর পড়িয়াছে।

সুধা আজ শুইতে যাইবে না, হেমচন্দ্রকে সন্ন্যাসী সাজাইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু বালিকা ভগিনীর পার্শ্বে সেই রকে একটু শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার কুসুমরঞ্জিত পাট তাহার আঁচলেই রহিল। নিদ্রাতেও সে সুন্দর পরিপক্ক বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ দু'টী হাস্যবিস্ফারিত, বোধ হয় বালিকা এই সুন্দর সুশীতল রজনীতে কোনও সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ক্ষণেক পরে বাহিরের কবাটে শব্দ হইল, বিন্দু তাহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ গিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন, হেমচন্দ্র বাটিতে প্রবেশ করিলেন।

হেমচন্দ্রের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর হইয়াছে, তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, মুখমণ্ডল শ্যামবর্ণ কিন্তু সুন্দর, নয়ন দু'টী অতিশয় তেজোব্যঞ্জক। অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন সুতরাং তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শরীরে ধূলি লাগিয়াছে, পা দু'টী ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। বিন্দু সযত্নে তাঁহাকে এক খানি চৌকি আনিয়া দিলেন এবং পা ধুইবার জল ও গামছা আনিয়া দিলেন; হেম হাতমুখ ধুইলেন।

বিন্দু। তোমার আস্‌তে এত রাত্রি হল? এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি?

হেম। আমি সন্ধ্যার সময় আসতেম, তবে কাটোয়ার একটী পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি বৈকালে আমাকে তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন, উপরোধ ক'রে কিছু জল খাবার খাওয়ালেন, সেই জন্য এত দেরী হ'ল। তা তোমরা খেয়েছ ত?

বিন্দু। সুধা খেয়ে ঘুমিয়েছে, আমি খাব এখন। তুমি ত বৈকালে জল খেয়েছ আর কিছু খাওনি, তবে ভাত এনে দি ?

হেম। আমার বিশেষ ক্ষুধা পায়নি, তবে ভাত নিয়ে এস, আর রাত্রি করার আবশ্যক নেই।

বিন্দু সেই রকে একটু জল ছিটাইয়া আসন পাতিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে থালে করিয়া ভাত আনিয়া দিলেন। খাবার সামান্য—ভাত, ডাল, মাছের ঝোল ও বাড়ীতে উচ্ছে ও লাউ হইয়াছে তাহাই ভাজা ও তরকারি। আর গাছে লেবু হইয়াছিল, বিন্দু তাহা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন,গাছ হইতে দুইটী ডাব পাড়াইয়া তাহা শীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাড়ীতে গাভী ছিল তাহার দুগ্ধ ঘন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আহারে বসিলেন, বিন্দু পার্শ্বে বসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন।

হেম। খোকার জন্য একটা ঔষধ এনেছি, সেটা এখন খাইও না, রাত্রিতে যদি ঘুম ভাঙ্গে, যদি কাঁদে তবে খাইও। আর যে চেষ্টায় গিয়েছিলেম তার বড় কিছু হ'ল না।

বিন্দু। কি হল ?

হেম। কাটোয়াতে আমার পরিচিত একটী উকীল আছেন, আমি তাঁর কাছে তোমার বাপের জমির কথা বল্লেম এবং সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে বল্লেম।

বিন্দু। তার পর ?

হেম। তিনি বল্লেন, মোকদ্দমা ভিন্ন উপায় নেই।

বিন্দু। ছি! জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে কি মোকদ্দমা করে ?

তিনি ছেলে বেলা আমাকে মানুষ করেছিলেন, আমার বে দিয়েছেন, জ্যেঠাই মা এখনও আমাদের জিনিস টিনিস পাঠিয়ে দেন, তাঁদের সঙ্গে কি মোকদ্দমা করা ভাল?

হেম। আমাদের বিবাহের জন্য আমরা তোমার জ্যেঠা মশাইয়ের নিকট বড় ঋণী নই; কিন্তু তুমি তখন ছেলে মানুষ ছিলে সে সব কথা বড় জান না, জানবার আবশ্যকও নেই। তথাপি তিনি তোমার জ্যেঠা, এইজন্যই তাঁর সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে ইচ্ছা নেই, কেবল অগত্যা কর্‌তে হয়।

বিন্দু। ছি! সে কাজটা কি ভাল হয়? আর দেখ আমরা গরিব লোক, আমাদের কি মোকদ্দমা পোষায়? আমরা গরিবের মত যদি থাক্‌তে পারি, দু'বেলা দু'পেট যদি খেতে পাই, ভগবানের ইচ্ছায় যদি ছেলেদু'টীকে মানুষ করতে পারি, তা হলেই ঢের হল। তোমার যে জমি জমা আছে তাতেই আমাদের গরিবের সোনা ফলে! তোমার পৈতৃক বাড়ীই আমার সাত রাজার ধন!

হেম। আমি যখন তোমাকে বিবাহ করেছিলেম, এরূপ কষ্টে চিরকাল জীবন যাপন কর্‌ব তা মনে করিনি। তুমি সহিষ্ণু, সাধ্বী, পতিব্রতা, এত কষ্ট সহ্য করেও মুখ ফুটে একটী কথাও কও না, সে তোমারই গুণ, কিন্তু আমি তা চক্ষে দেখিতে পারি না।

বিন্দুর চক্ষে জল আসিল। মনে মনে ভাবিলেন, "পথের কাঙ্গালীকে কোলে করিয়া লইয়া স্বর্গে স্থান দিয়াছ সেটা কি ভুলে গেলে?" প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন এমন ঘর বাড়ী

এখানে রাজার উপাদেয় দ্রব্য পাওয়া যায়, এখানে আমাদের অভাব কিসের ? একটী রাজার উপাদেয় জিনিস দেখবে ?”

হেম একটু হাসিয়া বলিলেন, “কৈ দেখি !”

বিন্দু উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন। সেই দিন গাছের কচি কচি আম পাড়িয়া তাহার অম্বল করিয়াছিলেন, স্বামীর সম্মুখে পাথর বাটীটি রাখিয়া বলিলেন, “একবার খেয়ে দেখ দেখি !”

হেম হাসিয়া অম্বল ভাতে মাখিলেন, খাইয়া সহাস্যে বলিলেন, “হাঁ, এ রাজার উপাদেয় দ্রব্য বটে, কিন্তু সে আমাদের এ রাজ্যের গুণ নয়, রাজরাণীর হাতের গুণ।”

ক্ষণেক পরে হেম আবার বলিলেন, “আমি সত্য বল্‌ছি জ্যেঠা মশাইয়ের সঙ্গে মোকদ্দমা করবার আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু তিনি তোমার পৈতৃক ধন কেড়ে নেবেন, আমাদের দরিদ্র বলে তুচ্ছ কর্‌বেন, তা আমি কখনই সহ্য কর্‌ব না ! আমি দরিদ্র, কিন্তু আমি অন্যায় সহ্য করিতে পারি না।”

বিন্দু। “তবে এক কাজ কর দেখি। ঐ ভাত ক’টী এই ঘন দুধ দিয়ে খেয়ে নাও দেখি, তা হলে গায়ে জোর হবে, তার পর কোমর বেঁধে নড়াই করো।”

হেমচন্দ্র যুদ্ধের সেই উদ্যোগ করিলেন, আবার গাভীদুগ্ধের অথবা রাজ্ঞীর রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিলেন। তখন বিন্দু বলিলেন।

“আচ্ছা, জ্যেঠা মশাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়টা মিটিয়ে ফেল্লে ভাল হয় না ? গ্রামেও পাঁচ জন ভদ্রলোক আছেন।”

হেম। সে চেষ্টাও করেছিলেম। তোমার জ্যেঠামশাই বলেন, যে জমিতে তাঁহারই স্বত্ব আছে, তিনি এখন দশ বৎসর অবধি জমিদারকে খাজানা দিচ্চেন, তিনি অর্থ ব্যয় করে জমির উন্নতি করেছেন এবং জমিদারের সেরেস্তায় আপনার নাম লিখিয়েছেন, এখন তিনি এ জমি হাতছাড়া করবেন না; তবে তোমাকে ও সুধাকে কিছু নগদ অর্থ দিতে সম্মত আছেন, তা জমির প্রকৃত মূল্য নয়, অর্দ্ধেক মূল্য অপেক্ষাও অল্প। কেবল আমরা দরিদ্র, এইজন্য তিনি এরূপ অন্যায় কর্‌ছেন।

বিন্দু। আমি মেয়ে মানুষ, তুমি যত দূর এ সব বিষয় বুঝ, আমি তত দূর পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয় তিনি যা দিতে চান তাতেই স্বীকার হওয়া ভাল। তিনি আমাদের গুরু, এক সময়ে আমাকে পালন করেছেন, যদি কিছু অল্প মূল্যেই তাঁকে একটা জিনিস দিলেম, তাতেই বা ক্ষতি কি? আর দেখ, মোকদ্দমা কর্‌লে আমাদের বিস্তর খরচ, কর্জ্জ কর্‌তে হবে, তা কেমন ক'রে পরিশোধ কর্‌ব? যদি মোকদ্দমায় জমি পাই, তা হলে ঋণ পরিশোধ কর্‌তে সে জমি বিক্রী হয়ে যাবে, আর জ্যেঠামশাই চিরকাল আমাদের শত্রু থাক্‌বেন। আর যদি মোকদ্দমায় হারি, তবে একূল ওকূল দুকূল গেল। তিনি যদি কিছু অল্প মূল্যই দেন, না হয় আমরা কিছু অল্প পেলেম, গোলমালটা এই খানেই শেষ হয়। আমি মেয়ে মানুষ, ও সব গোলমাল বুঝি না, মোকদ্দমা বড় ভয় করি, সেই জন্যই এরূপ বল্লেম; কিন্তু তুমি রাগ না করে বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, শেষে যেটা ভাল বোধ হয় সেইটে কর।

হেমচন্দ্র আহার সমাপন করিলেন, এক ঘটী জল খাইলেন, অনেক ক্ষণ বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন ঃ—

"তোমার মত মেয়ে মানুষ যার বন্ধু, সে জগতে ভাগ্যবান্। আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে যে উকীলের নিকট গিয়েছিলেম, সে আমার মূর্খতা। তোমার পরামর্শটী উৎকৃষ্ট। আমি এই পরামর্শই গ্রহণ কর্‌লেম, জ্যেঠামশাই বাড়ী এসেছেন, কল্যই আমি এ বিষয় নিষ্পত্তি কর্‌ব। আর পুনরায় যখন কোন পরামর্শের আবশ্যক হবে, এই ঘরের বৃহস্পতির সঙ্গে অগ্রে পরামর্শ কর্‌ব।"

বিন্দু সহাস্যে বলিলেন, "তবে বৃহস্পতির আর একটী পরামর্শ গ্রহণ কর।"

হেম। কি বল, আমি কিছুই অস্বীকার কর্‌ব না।

বিন্দু। ঐ বাটীতে যে দুধটুকু পড়ে আছে, সেটুকু চুমুক দিয়ে খাও দেখি।

হেমচন্দ্র অগত্যা বৃহস্পতির এই দ্বিতীয় পরামর্শটীও গ্রহণ করিলেন, পরে আসন ত্যাগ করিয়া আচমন করিলেন।

বিন্দু তখন হেমচন্দ্রের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, হাতে একটি পান দিলেন এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শয্যায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র সেই স্নেহময়ীকে সস্নেহে বলিলেন, "যাও, অনেক রাত্রি হয়েছে, তুমি খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে।" জগতের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বিন্দুবাসিনী তখন উঠিয়া পাকগৃহে আহারাদি করিতে গেলেন।

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত।)

কথাবার্ত্তা।

সন্ধ্যাবেলায়।

১ম। আমি সন্ধ্যা কেন এত ভালবাসি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সমস্ত দিন আমরা পৃথিবীর মধ্যে থাকি, সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবী-ছাড়াই বেশী—এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মত আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎমহারণ্যের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটী অতি ক্ষুদ্র ফল প্রতি দিন পাকিতেছে। তাহাই পৃথিবী। দিনে দেখিতাম পৃথিবীর মধ্যে ছোট-খাট যাহা-কিছু সমস্তই চলা-ফিরা করিতেছে, সন্ধ্যা-বেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে। রেল-গাড়ী যেমন পর্ব্বতের খোদিত গুহার মধ্যে প্রবেশ করে—তেমনি, পৃথিবী তাহার কোটি কোটি আরোহী লইয়া একটি সুদীর্ঘ অন্ধকারের গুহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছে—এবং সেই ঘোর নিশীথ-গুহার ছাদের মণ্ডপে অযুত গ্রহতারা এক একটী প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারাই নীচ দিয়া একটি অতি প্রকাণ্ডকায় গোলক নিঃশব্দে অবিশ্রাম গড়াইয়া চলিতেছে।

২য়। এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশ হূ হূ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমিষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

১ম। এমন একটী পৃথিবী কেন—যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূর্ত্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরামাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; অতি বৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষকোটি অযুত নিযুত, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু, লক্ষ যোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্র-বাষ্পরাশি, কিছুই স্থির নাই; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনলগোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে (কি তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ বাহু! কি তাহার বজ্রকঠিন বিপুল মাংসপেশী!), প্রতি পলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে, তখন কল্পনা অনন্তের কোন্ প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়।

২য়। অথচ দেখ, মনে হইতেছে প্রকৃতি কি শান্ত!

১ম। প্রকৃতি আমাদের সকলকে জানাইতে চায় যে, তোমরাই খুব মস্ত লোক—তোমরা আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ। বিদ্যুৎ মায়াবিনীকে তার্ দিয়া বাঁধিয়াছ—বাষ্পদানবকে লৌহ-কারাগারে বাঁধিয়া তাহার দ্বারা কাজ উদ্ধার করিতেছ। প্রকৃতি যে অতি বৃহৎ কার্য্যগুলি করিতেছে তাহা আমাদের কাছ হইতে কেমন গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর আমরা যে অতি ক্ষুদ্র কাজটুকুও করি, তাহাই আমাদের চোখে কেমন দেদীপ্যমান করিয়া দেয়।

২য়। নহিলে আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই অনন্তের কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে কি আমরা আর আজ করিতে পারি!

১। কম কাজ! বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত দেখ। অতি মহৎ শক্তিসম্পন্ন কত সহস্র নক্ষত্র-লোক, অথচ দেখ, তাহারা ছোট ছোট মাণিকের মত কেবল চিক্ চিক্ করিতেছে মাত্র! আমরা ফুলবাগানের মধ্যে বসিয়া আছি; মনে হইতেছে চারিদিকে যেন ছুটি। অথচ প্রতি গাছে, পাতায়, ফুলে, ঘাসে, অবিশ্রাম কাজ চলিতেছে—রাসায়নিক যোগ-বিয়োগের হাট বসিয়া গিয়াছে; কিন্তু দেখ উহাদের মুখে গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রমের ভাব কিছুমাত্র নাই। কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল বিরাম, কেবল শান্তি! আমি যখন আরাম করিতেছি, তখনো আমার আপাদমস্তকে কাজ চলিতেছে—আমার শরীরের প্রত্যেক কাজ যদি মেহন্নত করিয়া আমার নিজকেই করিতে হইত, তাহা হইলে কি আর জীবনধারণ করিয়া সুখ থাকিত!

২। প্রকৃতি বলিতেছে, আমি তোমার জন্য বিস্তর কাজ করিয়া দিতেছি। আর তুমি কি তোমার নিজের জন্য কিছু করিবে না? জড়ের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তোমার নিজের জন্য অনেক কাজ তোমার নিজেকেই করিতে হয়। তুমি পুরুষের মত আহার উপার্জ্জন করিয়া আন, তার পরে সেটাকে পাকযন্ত্রে বাঁধিয়া লইবার অতি কৌশলসাধ্য কার্য্যভার, সে আমার উপরে রহিল, তাহার জন্যে তুমি বেশী ভাবিও না। তুমি কেবল চলিবার উদ্যম কর, দেখিবে আমি তোমাকে চালাইয়া লইয়া যাইব।

১ম। ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃতি কখনো বলে না যে, আমি

করিতেছি। আমাদের বেশীর ভাগ কাজ যে প্রকৃতিসম্পন্ন করিয়া দিতেছে, তাহা কি আমরা জানি? আমাদের নিরুদ্যমে যে শতসহস্র কাজ চলিতেছে, তাহা চলিতেছে বলিয়া আমাদের চেতনাই থাকে না। এই যে অতি কোমল বাতাস বহিতেছে, এই যে আমার চোখের সম্মুখে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মুহুর্মুহুঃ লুটাইয়া পড়িতেছে, ইহারা আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহঃ শান্ত করিতেছে। জগতের চতুর্দ্দিক হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সান্ত্বনা বর্ষিত হইতেছে, অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সান্ত্বনার বাক্য বলিতেছে না—কেবল অলক্ষ্যে অদৃশ্যে আমার আহত হৃদয়ের উপরে তাহাদের মন্ত্রপুত হাত বুলাইয়া যাইতেছে, আহা-উহুটুকুও বলিতেছে না। আমাদের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী এই যে কার্য্যকুশল সদাব্যস্ত ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে থাকে, সে কেবল আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য; আমাদিগকে জানাইবার জন্য যে আমরাই স্বাধীন।

২। অর্থাৎ, অধীনতা খুব প্রকাণ্ড হইলে তাহাকে কতকটা স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে—কারাগার যদি মস্ত হয়, তবে তাহাকে কারাগার না বলিলেও চলে। বোধ করি, আমাদিগকে স্থায়ীরূপে অধীন রাখিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পাছে মুহুর্মুহুঃ আমাদের চেতনা হয় যে আমরা অধীন ও বৈরাগ্য সাধনাদ্বারা প্রকৃতি শাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, এই ভয়ে প্রকৃতি আমাদের হাতহইতে হাতকড়ি খুলিয়া

লইয়া আমাদিগকে একটা বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিয়াছে। আমরা ভুলিয়া থাকি, আমরা অধীনতার দ্বারা বেষ্টিত, মনে করি আমরা ছাড়া পাইয়াছি।

১। কিংবা এমনও হইতে পারে প্রকৃতি আমাদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতেছেন। দেখ না কেন, উত্তরোত্তর কেমন স্বাধীনতারই বিকাশ হইতেছে! জড় যে, সে নিজের জন্য কিছুই করিতে পারে না! উদ্ভিদ্ তাহার চেয়ে কতকটা উচ্চ। কারণ টিকিয়া থাকিবার জন্য খানিকটা যেন তাহার নিজের উদ্যমের আবশ্যক, তাহাকে রস আকর্ষণ করিতে হয়, বাতাস হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষ এত বেশী স্বাধীন যে, প্রকৃতি বিস্তর প্রধান প্রধান কাজ বিশ্বাস করিয়া আমাদের নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন। আর, স্বাধীনতা জিনিস বড় সামান্য নহে। জড়ের কোন বালাই নাই। আমরা কি করিলে যে ভাল হইবে, পদে পদে তাহা ভাবিয়া পাই না। আকুল হইয়া এক বার এটা দেখিতেছি, এক বার ওটা দেখিতেছি; এবং এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতেই আমরা শত সহস্র করিয়া মারা পড়িতেছি। উত্তরোত্তর যেরূপ স্বাধীনতার বিকাশ হইয়া আসিয়াছে, ইহারই যদি ক্রমিক চালনা হয়, তাহা হইলে মানুষের পর এমন জীব জন্মাইবে, যাহার ক্ষুধা পাইবে না, অথচ বিবেচনাপূর্ব্বক আহার করিতে হইবে (অনেক মানুষেরই তাহা করিতে হয়), রক্ত সঞ্চালন ও পরিপাককার্য্য তাহার নিজের কৌশলে করিয়া লইতে হইবে (মানুষের রন্ধন-কার্য্যও কতকটা তাহাই), ভাবিয়া চিন্তিয়া

তাহার শরীরের পরিণতি সাধন করিতে হইবে—এক কথায়, তাহার আপাদ-মস্তকের সমস্ত ভার তাহার নিজের হাতে পড়িবে। তাহার প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফল সে অনেকটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। একটি কথা কহিলে আঘাত-জনিত বাতাসে তরঙ্গ কত দূরে কত বিভিন্ন শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইবে তাহা সে জানিবে এবং তাহার সেই কথার ভাব সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত হৃদয়কে কতরূপে বিচলিত করিবে, তাহার ফল পুরুষানুক্রমে কত দূর কি আকারে প্রবাহিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২য়। আমাদের স্বাধীনতাও আছে, অধীনতাও আছে, বোধ করি চিরকালই থাকিবে। স্বাধীনতার যেমন সাধনা আবশ্যক, অধীনতারও বোধ হয় সেইরূপ সাধনা আবশ্যক। হয়ত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধীনতাকেই যথার্থ স্বাধীনতা বলে। কেবলমাত্র স্বাতন্ত্র্যকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে না। যথার্থ যে রাজা সে প্রজার অধীন, পিতা সন্তানের অধীন, দেবতা এই জগতের অধীন। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। জড় পদার্থ অধীনভাবে অধীন। মানুষেরা অধীনভাবে স্বাধীন। আর দেবতারা স্বাধীনভাবে অধীন। আমরা যখন মহত্ত্ব লাভ করিব, তখন আমরা জগতে দাসত্ব করিব, কিন্তু সেই দাসত্ব করাকেই বলে রাজত্ব করা। আর স্বতন্ত্র হওয়াকেই যদি স্বাধীন হওয়া বলে তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাকেই বলে স্বাধীনতা, বিনাশকেই বলে স্বাধীনতা।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

মহাপুরুষ।

প্রথম অধ্যায়।

পূরাকালে ভারতবর্ষে এক সুবিখ্যাত রাজবংশ রাজ্যশাসন করিতেন। এই রাজবংশের নাম কুরুবংশ। হস্তিনাপুর কুরু-রাজ্যের রাজধানী ছিল। এক সময়ে শান্তনুনামে কুরুবংশীয় রাজা হস্তিনার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র দেবব্রত ভীষ্মনামে জগতে বিখ্যাত।

গঙ্গাদেবী দেবব্রতের জননী। তিনি দেবব্রতকে প্রসব করিয়া কোন কারণবশতঃ পুত্রসহ পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান। শিশু জননীর অঙ্কে প্রতিপালিত ও শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে থাকেন। যখন তিনি শিক্ষার বয়সে পদার্পণ করিলেন, তখন গঙ্গাদেবী তাঁহাকে মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট অধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দেবব্রত অতি অল্পকালমধ্যে নানাশাস্ত্র বিশারদ ও সমুদয়শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে, জননী ও অধ্যাপকের নিকট যেরূপ সুশিক্ষা লাভ করিয়া বালকেরা উত্তরকালে উৎকৃষ্ট জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতে পারে, গঙ্গাদেবী ও বশিষ্ঠের নিকটে দেবব্রত তাহা সম্পূর্ণভাবে লাভ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদেবী পুত্রকে চিরদিন আপনার নিকটে রাখেন নাই। তাঁহাকে সমুদয় শাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য করিয়া শান্তনুর হস্তে সমর্পণ করেন। পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া শান্তনুর আনন্দের পরি-

সীমা রহিল না। তিনি পরমধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাবের প্রসর, সাধুতার সম্মান, বিদ্যার উন্নতি এবং দেশ ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি শান্তিময় রাজ্যের অধিপতি হইয়া বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপে হস্তিনার রাজসংসার সুখপূর্ণ ও ধর্ম্মপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ধর্ম্মপ্রধান রাজসংসারে প্রতিপালিত হইয়া দেবব্রতের মন স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া উঠিল।

বালক দেবব্রতের স্বভাব অতিশয় মধুর ছিল। তিনি গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি, বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি সমুচিত সম্মান ও শিষ্টাচার, দীনদুঃখীর প্রতি দয়া এবং সমবয়স্কদিগের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করিতেন। তিনি একান্ত পিতৃপরায়ণ ছিলেন। পিতার সেবাশুশ্রূষায় নিরন্তর রত থাকিতেন। পুরবাসিগণের সুখসাধনেও তাঁহার একান্ত যত্ন ছিল। এই সমস্ত গুণে দেবব্রত সকল লোকের অনুরাগভাজন হইতে লাগিলেন। মহারাজ শান্তনু, তনয়ের শূরতা, তেজস্বিতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দর্শন করিয়া এবং লোকমুখে তাঁহার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, অপরিসীম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি ধনুর্বিদ্যা, কি উপযুক্তরূপে প্রজাপালন ও রাজ্যসংরক্ষণ, সকল বিষয়েই দেবব্রতের অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিয়াছে। তিনি গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান্, দাসদাসীগণের প্রতি দয়াশীল এবং প্রজালোকের হিতকারী। শিষ্ট ও সাধুগণের প্রতি যেরূপ সদয়ভাব প্রদর্শন করেন, সেরূপ অশিষ্ট ও দণ্ডার্হের সমুচিত

দণ্ড বিধানপূর্ব্বক ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। শান্তনু স্পষ্টই বুঝিলেন, গুণে, জ্ঞানে, বীরত্বে দেবব্রত ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছেন। অতএব দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, এখন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। মহারাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন। অতঃপর তিনি একদিন রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া সকলের সম্মতিক্রমে শুভকর্ম্মনির্ব্বাহের শুভদিন নির্দ্ধারিত করিলেন এবং দেবব্রতের অভিষেকবার্ত্তা রাজ্যমধ্যে ঘোষিত করিয়া দিলেন।

এই সংবাদে হস্তিনাপুর আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। উল্লাসধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। প্রজাগণ ভাবী যুবরাজের মঙ্গলকামনায় প্রফুল্লচিত্তে নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল, কেহ কেহ মূল্যবান বসনভূষণ পরিধান করিল, কেহ কেহ বা দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র ও ধনরত্ন বিতরণ করিল। জনতায় রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্তুতিপাঠকেরা মঙ্গলবাক্যে দেবব্রতের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। বাদ্যকরেরা বাদ্যোদ্যম ও গায়কেরা গান করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে জয়শব্দ ও কুলকন্যাগণ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। শুভক্ষণে দেবব্রত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবব্রত যৌবরাজ্যে স্থাপিত হইয়া চারি বৎসর কাল রাজকার্য্য সম্পাদান করিলেন। তিনি যেরূপ ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অনুকম্পার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রজাগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইল। সেই অল্পকালমধ্যেই তাঁহার বলবীর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মানুরাগ, পরার্থপরতা ও সৎকার্য্যশীলতার প্রশংসায় চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এক দিকে শত্রুপক্ষ দেখিল, তিনি মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় তেজোময়, অন্যদিকে আশ্রিত ও অনুগতগণ বুঝিল, তিনি সুধাংশুর ন্যায় শীতল ও স্নিগ্ধ। এমন গুণবান্ নরপতির শাসনাধীন থাকিয়া প্রজাকুল পরম পরিতোষ লাভ করিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র আনন্দের উচ্ছ্বাস, শান্তির প্রবাহ ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি দেখা যাইতে লাগিল।

দেবব্রত সর্ব্বদা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও পিতৃশুশ্রূষায় বিরত ছিলেন না। পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াই তিনি সুখ অনুভব করিতেন, পিতার প্রফুল্লমুখ দেখিলেই চরিতার্থ হইতেন। পিতা অপেক্ষা গুরুতর ব্যক্তি আর কে আছেন? পিতাই স্বর্গ, পিতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, পিতা আকাশ হইতেও মহত্তর। পিতা প্রীত হইলেই সকল দেবতা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। দেবব্রত পিতার আদেশে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন। এই সময়ে তিনি পিতার প্রীতিসম্পাদন জন্য যে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া অলৌকিক পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিলেন, ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। যত কাল পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজ

বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল তিনি সেই কার্য্যের জন্য পূজ্য ও বরণীয় থাকিবেন।

দেবব্রত দেখিলেন, পিতা দিন দিন বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছেন; তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, মন সর্ব্বদাই উদাসীন। জনকের এরূপ দশা দেখিয়া দেবব্রত বিচলিত হইলেন। তিনি অনুসন্ধানে অবগত হইলেন, মহারাজ সত্যবতীনাম্নী এক ধীবরকন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, সুতরাং সত্যবতী-তনয়ের রাজা হইবার অধিকার নাই। এজন্য দাশরাজ তাঁহার পিতাকে কন্যাদান করিতে অসম্মত। দেবব্রত দেখিলেন, তিনিই পিতার মর্ম্মপীড়ার একরূপ কারণ। তখন তিনি স্বার্থচিন্তা ও বিষয়বাসনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া, জগতে কীর্ত্তির এক সুবর্ণময় স্তম্ভ সংস্থাপিত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি অনতি-বিলম্বে প্রবীণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত দাশরাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া পিতার নিমিত্ত তাহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন।

দাশরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিল। রাজপুত্র আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধীবর সমাগত ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে কহিল, "যুবরাজ, আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়? কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে রাজকুলে শত্রুতার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। আপনি যাহার উপরে ক্রুদ্ধ হইবেন, তার জীবনের আশা কোথায়?" দেবব্রত দাশরাজের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা

করিয়া বলিতেছি, যিনি তোমার কন্যার গর্ভে জন্মধারণ করিবেন, হস্তিনার রাজসিংহাসন তাঁহারই হইবে। আমি চিরদিন তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিব। আমি অদ্যই আমার উত্তরাধিকারস্বত্ব তাঁহাকে দান করিলাম।”

দেবব্রতের এই অসাধারণ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। এখন দাশরাজ নিবেদন করিল, “আপনি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা আপনারই উপযুক্ত। আপনার প্রতিজ্ঞাপালনবিষয়ে আমি অণুমাত্র সন্দেহ করি না। কিন্তু আপনার পুত্রেরা আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।”

দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, “উপস্থিত ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই আমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন তোমার সংশয় দূর করিবার জন্য আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব; ইহা জীবনে কখনও দারপরিগ্রহ করিব না।” দাশরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁহার এই লোকাতীত স্বার্থত্যাগ ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্যের জন্য ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

দেবব্রত দাশরাজের সম্মতি পাইয়া সত্যবতীর সহিত পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এ সংবাদ শীঘ্রই সমস্ত দেশে প্রচারিত

হইলে তাঁহার গুণানুবাদে ধরিত্রী পূর্ণ হইয়া গেল। মহারাজ শান্তনু পুত্রকৃত এই দুঃসাধ্য কর্ম্মের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সাতিশয় পুলকিত হইলেন এবং পুত্রকে ইচ্ছামরণ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবব্রত ধীবর-কন্যা সত্যবতীর সহিত মহারাজের উদ্বাহ-ক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিলেন। এইরূপ ভীষণ কর্ম্ম করাতে যুবরাজ দেবব্রত অতঃপর জগতে ভীষ্মনামে বিখ্যাত হইলেন।

ভীষ্ম পিতার সন্তোষবিধানের জন্য ঐহিক সুখসম্ভোগে জলাঞ্জলি দিলেন। এজন্য তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল না। তিনি পিতার প্রফুল্লমুখ ও প্রসন্নদৃষ্টি অবলোকন করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। বিমাতা সত্যবতীকে তিনি জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দুঃখে ও কষ্টে বনবাসী পাণ্ডবদিগের দ্বাদশবৎসর অতীত হইয়া গেল। এখন তাঁহারা অজ্ঞাতভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পণ অনুসারে তাঁহাদিগকে একবৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। অঙ্গীকার ছিল, এই এক বৎসরের মধ্যে যদি তাঁহারা পরিজ্ঞাত হন, তাহা হইলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস আশ্রয় করিবেন। স্বার্থপর দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের বিস্তীর্ণ রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখন যাহাতে চিরকাল তাহা নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিতে পারেন,

এই উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে চরপ্রেরণ করিলেন। দুর্য্যোধনের চরগণ কোন প্রকারেই পাণ্ডবদিগের সন্ধান পাইল না। পাণ্ডবগণ পূর্ণ এক বৎসর এবং অতিরিক্ত পঞ্চ মাস অজ্ঞাতবাস করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা বনবাস ও অজ্ঞাতবাস নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া ভীষ্মের আনন্দের সীমা রহিল না।

এখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন স্বার্থের কুহকে মুগ্ধ ছিলেন, তিনি পাণ্ডবদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। ভীষ্ম কত সৎপরামর্শ দিলেন, কিন্তু স্বার্থান্ধ দুর্য্যোধনের কর্ণে তাহার কিছুই স্থানপ্রাপ্ত হইল না। ধৃতরাষ্ট্রও অনুচিত পুত্রবাৎসল্যের বশীভূত হইয়া সদসৎবিবেচনা বিসর্জ্জন দিলেন।

অগত্যা মহামনা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে পঞ্চভ্রাতার জন্য পাঁচ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুলক্ষয়কর আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হইতে না পারে, ভ্রাতার শোণিতে ভ্রাতার দেহ কলঙ্কিত না হয়, ইহাই ভীষ্মের ইচ্ছা। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। দুর্য্যোধন এখনও নিবৃত্ত হউন্। ভ্রাতৃত্বের পবিত্রবন্ধন আর যেন শিথিল না না হয়; দুর্য্যোধন এখনও পাণ্ডবদিগকে “ভাই” বলিয়া সম্বোধন করুন্, জগতের কল্যাণ হইবে, দুর্য্যোধনের মঙ্গল হইবে, ভীষ্ম চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু ভীষ্মের কামনা পূর্ণ হইল না। দুর্য্যোধন

সদম্ভে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও প্রদান করিব না।" এতদিনে ভীষ্মের সমুদায় আশাভরসা ফুরাইয়া গেল। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, মৃত্যু এই অধার্ম্মিকদিগের একান্ত সন্নিহিত হইয়াছে।

অবিলম্বে তুমুল সংগ্রামের আয়োজন হইল। পাণ্ডবেরা রাজ্যোদ্ধারের জন্য ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষে সৈনিকদল সংগৃহীত হইল। বীরগণের পদভরে ও ভীষণ যুদ্ধোদ্যমে ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। ভীষ্ম এই যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পতন অবধারণ করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের অনুরোধক্রমে তাঁহাকেই স্নেহাস্পদ পাণ্ডবদিগের বিপক্ষে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময়ে ভীষ্মের অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল। ভ্রাতৃবিরোধ তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিমত। এই অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ভীষ্ম যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এখন আবার দুর্য্যোধনের পক্ষে তিনি পাণ্ডবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের অন্নে এত দিন জীবনধারণ করিয়াছেন, অতএব প্রাণ থাকিতে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারেন না। পরাজয় অনিবার্য্য জানিয়াও, দুর্য্যোধন অবিনীত ও অসদাচার জানিয়াও, ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

কর্ত্তব্যজ্ঞান ভীষ্মকে অতুল শক্তি প্রদান করিত। তিনি কৌরবসৈন্যের অধিনায়ক হইয়া উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধবেশ ধারণপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠির অস্ত্রশস্ত্র-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহার

পদবন্দনা করিলেন এবং যুদ্ধে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্নেহরসে ভীষ্মের হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “বৎস, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি এই সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিতে, তাহা হইলে আমার অপরিসীম মনঃকষ্টের কারণ হইত। আমি প্রশস্তমনে অনুমতি করিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর। বৎস, ধর্ম্মই জগতে একমাত্র সারপদার্থ। আমি ধর্ম্মানুরোধেই কুরুরাজের আজ্ঞাধীন হইয়া তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছি। তুমিও এখন ক্ষত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ভীষ্ম স্নেহাস্পদ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের পবিত্র চরণে প্রণাম করিলে ভীষ্ম তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃ-করণে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি স্নেহভাজন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়া তাঁহাকে বাষ্পাকুলনয়নে বিদায় দিলেন। আহা! স্বর্গেও কি এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা এই চিত্রকে মলিন করিতে পারে?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভীষ্ম আপনার জীবনকে দুঃখ ও নৈরাশ্যের সাগরে নিমজ্জিত করিয়াও যাহাতে ধার্ম্মিকের জয় হয় এবং অধার্ম্মিকের হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ জন্মে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিতেন। তাঁহার এক দিকে ধর্ম্ম, অন্যদিকে সমস্ত সংসার। ধর্ম্মের সহিত তুলনায় ঐহিক সুখসম্পদ তাঁহার নিকটে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইত। তিনি মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মহইতে এক পদ

বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ধর্ম্মরক্ষার জন্য কুরু-ক্ষেত্র প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া স্নেহাস্পদ পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন।

অর্জ্জুন ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর! পৌত্র ও পিতামহে সংগ্রাম,—অহো! কি শোকাবহ ঘটনা! পিতামহের স্নেহপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া অর্জ্জুন শোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সমরবাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের নিকটে শত্রুমিত্র ভেদ নাই, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ বিচার নাই। যে কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিবে, তাহারই সহিত প্রতিযুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। ইহার ব্যতিক্রমে ক্ষত্রিয়কে নিরয়গামী হইতে হয়। অর্জ্জুন শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অপূর্ব্ব রণসজ্জা, ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার ও কৃতান্ততুল্য সংহারমূর্ত্তি দর্শনে জীবগণ ভয়ে নিষ্পন্দ হইল। ভীষ্ম প্রাণপ্রতিম অর্জ্জুনের রণনৈপুণ্যে বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অপরূপ দৃশ্য! দুই বীরের যুদ্ধ, একের চেষ্টা অপরের নিধন। অথচ, আশ্চর্য্য! ভীষ্ম অর্জ্জুনের সাহস ও বীরত্বে অকৃত্রিম হর্ষপ্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালনে ভীষ্ম পরাঙ্মুখ নহেন। ভীষ্মের শরজালে অর্জ্জুন ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তাঁহার বিশাল সেনামণ্ডল ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইতে লাগিল। ভীষ্মের হৃদয় কোমলতা ও কাঠিন্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে সুকোমল পুষ্পশোভিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

এই ভীষণ সংগ্রাম নয় দিন ব্যাপিয়া চলিতে লাগিল।

বার্দ্ধক্যেও ভীষ্ম যৌবনের তেজস্বিতায় পূর্ণ ছিলেন,—তাঁহার বিজয়িনী শক্তি কিছুতেই অপদস্থ হইল না। সেই বৃদ্ধবয়সেও তিনি নয় দিন পর্য্যন্ত অতুল বিক্রম ও রণচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

দশম দিবসে ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের ভীষণতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভীষ্ম অর্জ্জুনের উপরে প্রখর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র সৈন্যের রুধিরে রণস্থল কর্দ্দমময় হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য অর্জ্জুন জয়ের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষে পৃথিবী ঘূর্ণমান হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক্ যেন তমোজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই সময়ে ভীষ্ম দেখিলেন, অর্জ্জুনের সম্মুখ-ভাগে দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী দণ্ডায়মান হইয়া শরবৃষ্টি করিতেছে। শিখণ্ডী ক্লীব। ভীষ্ম স্ত্রী ও ক্লীবের শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতেন না। শিখণ্ডী ও অর্জ্জুনের শরসমূহে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হইতে লাগিল। তথাপি তিনি ক্লীবের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন না, বা যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন না। দেহে প্রাণ থাকিতে কি ভীষ্ম তেজস্বিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন? তিনি শিখণ্ডী ও অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাত অকাতরে সহ্য করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবিশ্রান্ত শরাঘাতেও তাঁহার জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হইল না। তিনি অনন্তপদ ধ্যান করিতে করিতে অস্ত্রসমূহদ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হইয়া সায়ংকালে রথহইতে পতিত হইলেন। বাণসমূহে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, রথহইতে পতিত হইয়াও তাঁহার শরীর ভূমিস্পর্শ করিল না। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান

হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই যুদ্ধক্ষেত্র হাহাকার ও বিলাপধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পাণ্ডব ও কৌরবগণ শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্নেহাধার পিতামহের অন্তিমশয্যা দর্শন করিয়া সকলের চিত্তই অধীর হইয়া উঠিল। তাঁহারা শোকাকুল মনে তাঁহার চরণপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন সেখানে ক্ষণকাল যেন শোকের প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম মধুরবাক্যে সকলকে তৃপ্ত করিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে কহিলেন, "বৎসগণ, দেখ আমার মস্তক উপাধান ব্যতিরেকে লম্বমান হইতেছে, অতএব আমকে উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।" এই বাক্য শুনিয়া দুর্য্যোধন সুকোমল উপাধানসমূহ ত্বরায় আনিয়া দিলেন। সেই সকল ভীষ্মের মনোমত হইল না। তিনি সহাস্যবদনে অশ্রুজলাষিক্ত অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া শরশয্যার উপযুক্ত উপাধান যাচ্ঞা করিলেন। বীর ভিন্ন বীরের মর্ম্ম কে বুঝিবে? অর্জ্জুন পিতামহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গাণ্ডীবগ্রহণপূর্ব্বক ভীষ্মের চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে সুতীক্ষ্ণ তিনটি শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা ভীষ্মের মস্তকে অপূর্ব্ব উপাধানস্থানীয় হইল। ভীষ্ম অর্জ্জুনের এই বীরোচিত কার্য্যদ্বারা সময়োচিত উপাধান পাইয়া যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনের আদেশে সুবিজ্ঞ শল্য চিকিৎসকগণ ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন,

"বৎস, আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। ইহাদিগকে অর্থদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিহিত অন্তিমশয্যায় শয়ান হইয়াছি। প্রাণবিয়োগ হইলে এই সমস্ত শরের সহিতই আমার সৎকার করিও।" অনন্তর ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস দুর্য্যোধন, পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, সুশীতল সলিলধারায় আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর।" দুর্য্যোধন সুবর্ণভৃঙ্গার পূরিয়া শীতল জল প্রদান করিলেন। কিন্তু শরশয্যাশায়ী বীরকেশরীর নিদারুণ তৃষ্ণা কি এই সামান্য জলে নিবৃত্ত হইতে পারে? তিনি সহাস্য-বদনে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নিকটে সলিলপ্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুন গাণ্ডীবগ্রহণপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে ভীষ্মের চরণে প্রণাম করিয়া মহাবলে পৃথিবীবক্ষে শর নিক্ষেপ করিলেন। অচিরাৎ শরবিদ্ধ স্থানহইতে দিব্যগন্ধযুক্ত শীতল বারিধারা সমুত্থিত হইল। ভীষ্ম পরমানন্দে সেই অমৃততুল্য জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এইরূপে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিদারুণ পিপাসার শান্তি হইল।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আসন্নমৃত্যু পিতামহের অনুরোধ রক্ষা কর; এখনও আত্মবিগ্রহে বিরত হও। কুরুকুলের প্রজ্জ্বলিত বিবাদবহ্নি এইখানেই নির্ব্বাপিত হউক। বৎস, কেন বৃথা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাংশ না দিয়া আত্মবিনাশকর ভীষণ যুদ্ধের সংঘটন করিয়াছ? পরার্থহারীর পাপের ইয়ত্তা নাই। যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভাগ না দিয়া তুমি যে পাপসঞ্চয় করিতেছ, ইহার পরিণাম অতি বিষময় হইবে। এখনও বলি, ভীষ্মনিপাতের পর আর সৎপরামর্শ উপেক্ষা করিও না; এখনও পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ

দিয়া তাঁহাদের সহিত প্রফুল্লমনে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হও। স্বজন বধ করিলে কি হইবে? বৎস, পিতামহের শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি রক্ষিত হও।" কিন্তু হায়! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পুণ্যাত্মা ভীষ্মের এই হিতকরবাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। তখন ভীষ্ম নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

মহাপুরুষের হৃদয় কি উদার ও কি স্নেহপূর্ণ ছিল! যে দুর্য্যোধন তাঁহার হিতকর মন্ত্রণায় প্রতিনিয়তই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার হিতের জন্য তিনি মরণসময়েও সদুপদেশ দিতে বিমুখ হন নাই। ভীষ্ম অন্তিমকালেও শান্তিস্থাপনে ঐকান্তিক প্রয়াস পাইয়া গিয়াছেন।

পাপাচারীর প্রতি ভীষ্মের সহানুভূতি দেখা যাইতেছে। তিনি পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, পাপের প্রতি করেন নাই। যে অসদাচারের জন্য দুর্যোধন সাধুসমাজের নিন্দার্হ, তিনি কুত্রাপি তাহার সমর্থন করেন নাই। ভীষ্ম পাপী ও পতিতের উদ্ধারের জন্যই চিরদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন।

দুর্য্যোধন ভীষ্মের সদুপদেশে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া রণত্যাগে সম্মত হইলেন না। এই অবাধ্যতার কি শোচনীয় পরিণামই হইল! পাণ্ডবেরা বহুদিনব্যাপী যুদ্ধে কৌরবপক্ষের অসংখ্য সৈন্য ও সেনানী নিপাতিত করিয়া সর্ব্বশেষে দুর্য্যোধনকে নিহত করিলেন। এতদিনে ধৃতরাষ্ট্রের অধর্ম্মের ফল ফলিল। তিনি যে স্নেহপ্রবণতায় পুত্রদিগের পরার্থহারিতা ও স্বজন-দ্রোহিতায় প্রশ্রয় দিতেন, তাহার ফল হইল,—শতপুত্রের নিধনশোক।

অতঃপর যুধিষ্ঠির রাজ্যগ্রহণ করিয়া পরমপূজনীয় ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। তখন পর্য্যন্ত ভীষ্মের স্বাভাবিক মধুর শান্তভাবের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ ভক্তিভাবে তাঁহার পবিত্রচরণতলে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সেই স্থানে নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট হইতে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল অবগত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের হৃদয় জ্ঞান ও ভক্তিতে, পুণ্য ও পবিত্রতায় অধিকতর পূর্ণ হইতে লাগিল। সেই সকল উপদেশে ভীষ্ম যেরূপ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিকৌশল এবং গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিলেন, তাহা চিন্তা করিলে সকলের মনেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। এইরূপে কিয়ৎ দিন অতিবাহিত হইলে, একদা ভীষ্ম নিমীলিতনেত্রে সমাধিস্থ হইয়া, অনন্তপদ চিন্তা করিতে করিতে, সূর্য্যের উত্তরায়ণ-কালে, অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে মহাপুরুষের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইল, এইরূপ পবিত্রভাবে পুণ্যাত্মা ভীষ্মের পবিত্রজীবন পরিসমাপ্ত হইল।

কত যুগযুগান্ত চলিয়া গেল ভীষ্ম এ সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে আদর্শ চরিত্র জনসমাজের নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকল লোকেরই আদরণীয়। তাঁহার ন্যায় পিতৃভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনয়ী, বীর, পণ্ডিত, সর্ব্বভূতহিতৈষী, গুণবান্, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধর্ম্মশীল হওয়া সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্মই মানবজীবনের পরম সহায়,

অনন্তকালের সম্বল এবং দেবত্বলাভের উপায়,—ভীষ্ম ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকলকে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে আসক্তি ও বৈরাগ্যের সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তিনি রাজাসনে বসিয়াও উদাসীন, যোদ্ধা হইয়াও ধর্ম্মবেত্তা, ধর্ম্মশীল হইয়াও সর্ব্বভূতে প্রেমময়। ফলতঃ ভীষ্মের ন্যায় মহাপুরুষ এ সংসারে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ-চরিত্র, লোকশিক্ষার উপযুক্ত সহায় হইয়া, অনন্তকাল জগতে বিদ্যমান থাকিবে।

শ্রীপরেশনাথ মহলানবীশ (সংক্ষিপ্ত)।

ভ্রমনিরাস।

সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রের জ্ঞানবৈভব।

পুরাণের রূপকময় আখ্যান শুনিয়া অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীকে ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ বলিয়া জানিতেন, পৃথিবী যে গোল এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোনরূপ ধারণা ছিল না। এইরূপ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের উদ্ভাবিত পৃথিবীর গোলত্ব বিষয়ক মত ভারতবর্ষে প্রচারপূর্ব্বক এ দেশে নূতন তত্ত্ব প্রচার করিলেন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, হিন্দুজ্যোতিষে কোন সার কথা নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীর আকৃতি, পরিমাণ, গতি ও গ্রহণাদি বিষয়ে আধুনিক ইউরোপীয় পরিশুদ্ধ মত যে এ দেশে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিল, তাহা কয় জনে অবগত আছেন?

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবী প্রথমে সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল, পরে এতকাল পর্য্যন্ত শূন্যপথে প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হওয়ায় এখন উহার মধ্যস্থল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয় চাপিয়া গিয়াছে। এইরূপে পৃথিবী বর্ত্তমান সময়ে একটি কমলালেবুর আকার ধারণ করিয়াছে।

আমরা বলি, যে সময়ে পৃথিবী এই কমলালেবুর আকার ধারণ করে নাই, যে দিন এই পৃথিবী সম্পূর্ণরূপেই গোলাকার ছিল, সেই সময়—সেই প্রাচীন হইতেও প্রাচীনতম কালে হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বসুমতীর গোলত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহাকে "ভূমণ্ডল" আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, সেই দিন তাঁহারা বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবী কদম্বকুসুমের ন্যায় গোলাকার। সিদ্ধান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্র বলেন,—কদম্বকুসুমের গ্রন্থি যেরূপ কেশরকলাপে আবৃত থাকে, ভূমণ্ডল সেইরূপ বন, পর্ব্বত, গ্রাম ও নগরাদিতে আবৃত আছে *।

বিদেশ হইতে আর একটা নূতন তত্ত্ব ভারতে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই। তাহা এই যে, পৃথিবী কোন আধারে ভর দিয়া রহে নাই, ইহা শূন্যদেশে অবস্থান করিতেছে। আমরা বলি পৃথিবীর এই শূন্যদেশে অবস্থানবার্ত্তা ভারতবর্ষে অপরিজ্ঞাত নহে। সিদ্ধান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্র বলেন, এই গোলাকার বিশ্ব অন্য কোন আধারের অপেক্ষা না করিয়া আপন শক্তিবলে আকাশে

* সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসরৈরিব॥

অবস্থান করিতেছে *। শুধু কি এই? পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণে চন্দ্রের উপরে পৃথিবীর গোলাকার ছায়া-পতনের দৃষ্টান্ত, দূরহইতে তালসদৃশ উচ্চ বৃক্ষের চূড়ামাত্র অবলোকিত হওয়ার দৃষ্টান্ত—আধুনিক ভূগোলতত্ত্বের এই সকল যুক্তিও ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সেই স্মরণাতীত প্রাচীনকালে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন †।

সংস্কৃত শাস্ত্রহইতে যতই বিজ্ঞানের অনুশীলন করা যায়, ততই তাহার অপূর্ব্ব জ্ঞান বৈভব দর্শনে আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। এই ভারতবর্ষে এক দিন গণিতবিজ্ঞানাদির কতই উন্নতি হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া কখন বিস্ময়ে বিভোর হইতে হয়, কখন বিপুল পুলকে আকুল হইয়া আনন্দে অধীর না হইয়া থাকা যায় না।

পঞ্জিকায় যে রাশিচক্র অঙ্কিত থাকে তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন পৃথিবী স্থির, আর গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিক দিয়া রাশিচক্রে ভ্রমণশীল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। রাশিচক্র স্থিরভাবে আছে, পৃথিবীই ঘূরিয়া ঘূরিয়া গ্রহনক্ষত্রগণের প্রতিদিনের উদয়াস্ত

---

* ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা
বৃত্তৈর্বৃত্তোবৃতঃ সন্ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োঽয়ং।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তি তীহাস্য পৃষ্ঠে
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ॥
(সিদ্ধান্ত শিরোমণিঃ)

† সমতা যদি বিদ্যতে ভুবস্তরবস্তালনিভাবহুচ্ছ্রয়াঃ।
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং নুরহো যান্তি সুদূরসংস্থিতাঃ॥ (লগ্নাচার্য্য)

সম্পাদন করিতেছে। অনেকে জানেন, এই তত্ত্বটি আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত। কিন্তু ইউরোপীয় মত প্রচারিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—(১) রাশিচক্র স্থিরই আছে, পৃথিবীই ঘূরিয়া ঘূরিয়া গ্রহনক্ষত্রগণের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে, * (২) অনুলোকগামী জলযানের আরোহিবর্গ যেরূপ পার্শ্ববর্ত্তী স্থিরপদার্থকে বিলোমগামী দেখিতে পায়, লঙ্কাতে (বিষুবদ্‌বৃত্ত প্রদেশে) স্থির নক্ষত্রাদিকেও সেইরূপ পশ্চিমাভিমুখে গমনশীল বলিয়া বোধ হয় †।

চন্দ্র নিজে দীপ্তিহীন; উহা সূর্য্যাতপে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকে—এ কি আজিকার কথা? আমরা কিন্তু ইহা পরের মুখে শুনিয়াই শিখিয়াছি। আমাদের জ্যোতিঃশাস্ত্র বলেন, রৌদ্রস্থিত ঘট যেরূপ সূর্য্য-কিরণদ্বারা এক দিকে আলোকিত এবং নিজের ছায়াদ্বারা অপর দিকে চাক্‌চিক্যহীন হয়, সেই রূপ চন্দ্রের যে দিক্ সূর্য্যের অভিমুখে থাকে সেই দিক্ জ্যোতির্ম্ময় এবং তাহার বিপরীত দিক্ নিজের ছায়ায় বিমলিন থাকে ‡। এরূপ কত

---

* ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং।

† অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

‡ তরণিকিরণসঙ্গাদেষপীযূষপিণ্ডো দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি তদিনরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রীর্ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ।

জ্ঞানগর্ভ দৃষ্টান্ত, কত অপূর্ব্ব যুক্তির সমাবেশে ভারতীয় জ্যোতিঃ-শাস্ত্র অলঙ্কৃত, কে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারে ?

অনেকে মনে করিতে পাড়েন, সংস্কৃত শাস্ত্রে পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির নাম গন্ধও নাই ; এই কথাটা ভারতবর্ষে একেবারে নূতন। কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করুন, তাঁহাদের সে ভ্রমও দূর হইবে। ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা স্যার্ আইজাক্ নিউটন্ পার্থিব আকর্ষণসংক্রান্ত সমুন্নত মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জগতের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই পার্থিব আকর্ষণ-শক্তির বিষয় মহামহোপাধ্যায় ভাস্করা-চার্য্য প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তিবলে আকাশে নিক্ষিপ্ত গুরুপদার্থ ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হয় এবং তাহাতেই ঐ পদার্থকে পতন-শীল বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে *।

আর্য্য ঋষিগণ এরূপ সমুজ্জ্বল জ্ঞানরত্নমালায় মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় গভীর চিন্তা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আজ কেবল অজ্ঞানতাবশতঃ লোকে হিন্দু জ্যোতিষের নামে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে সাহসী হয়।

শ্রীপরেশনাথ মহলানবীশ (সংক্ষিপ্ত)।

* আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চন্দ্রাপীড়ের রাজ্যাভিষেক।

অবন্তীদেশে উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। যে স্থানে ভুবন-ত্রয়ের স্বর্গস্থিতিসংহারকারী দেবাদিদেব মহাদেব অবস্থিতি করেন, যে স্থানে শিপ্রানদী তরঙ্গরূপ ভ্রূকুটিবিস্তারপূর্ব্বক ভাগীরথীর প্রতি উপহাস করিয়া বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তথায় তারাপীড় নামে মহাযশস্বী প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় নিজভুজবলে অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় ও প্রজাগণের ক্লেশ দূর করিয়া সুখে রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া, লক্ষ্মী কমলবন তুচ্ছ করিয়া, নারায়ণবক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; সরস্বতী চতুর্ম্মুখের মুখপরম্পরায় বাস করা ক্লেশকর বোধ করিয়া তাঁহারই রসনামণ্ডলে সুখে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অমাত্যের নাম শুকনাস। শুকনাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, নীতিশাস্ত্রপ্রয়োগ-কুশল, ভূভারধারণক্ষম, অগাধবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার পত্নীর নাম মনোরমা। ইন্দ্রের বৃহস্পতি, নলের সুমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র যেরূপ উপদেষ্টা ছিলেন, শুকনাসও সেইরূপ রাজকার্য্যপর্য্যালোচনাবিষয়ে রাজাকে যথার্থ সদুপদেশ দিতেন। মন্ত্রীর বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ যে জটিল ও দুরবগাহ কোন কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলেও বিচলিত বা প্রতিহত হইত না। শৈশবাবধি অকৃত্রিম প্রণয়সঞ্চার হওয়াতে রাজা তাঁহাকে কোন

বিষয়ে অবিশ্বাস করিতেন না। তিনিও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নৃপতির হিতকার্য্য অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। পৃথিবীতে রাজার তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং প্রজাদিগের উৎপাত ও অসুখ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন। ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে মহিষীর যে কিছু গর্ভদোহদ হইতে লাগিল, রাজা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রসব-সময় সমাগত হইলে মহিষী শুভদিনে শুভলগ্নে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। নরপতির পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নগরবাসী লোকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। রাজবাটী মহোৎসবময়, নগর আনন্দময়, ও পথ কোলাহলময় হইল। গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত, বাদ্য আরম্ভ হইল। নরপতি সানন্দচিত্তে দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে অর্থদান করিতে লাগিলেন; যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিল, তাহাকে তাহাই দিলেন। কারাবদ্ধকে মুক্ত, ধনহীনকে ঐশ্বর্য্যশালী করিলেন।

গণকেরা গণনাদ্বারা শুভ লগ্ন স্থির করিয়া দিলে নরপতি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর সহিত গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন, সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে দুই পার্শ্বে সলিলপূর্ণ দুই মঙ্গলকলস, স্তম্ভের উপরিভাগে বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত মঙ্গলমালা। পুরন্ধ্রীবর্গ কেহ বা ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতেছে, কেহ বা মাতৃকাগণের বিচিত্র মূর্ত্তি চিত্রপটে লিখিতেছে। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সূতিকাগৃহের অভ্যন্তর শান্তি-জল নিক্ষেপ করিতেছেন।

পুরোহিতেরা নারায়ণের সহস্র নাম পাঠ করিয়া শুভ স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন। রাজাও জল অনল স্পর্শপূর্ব্বক সূতিকাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রাজকুমার মহিষীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। দেহপ্রভায় দীপপ্রভা তিরোহিত হইয়াছে; এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, সাক্ষাৎ কুমার রাজকুমাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজা নিমেষশূন্য-লোচনে বারংবার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইল না। যত বার দেখেন, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভিনব বোধ হয়। সস্পৃহ ও প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এবং আপনাকে চরিতার্থ ও পরমসৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। শুকনাস সতর্কতাপূর্ব্বক বিস্ময়বিকসিত-নয়নে রাজকুমারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দেখুন কুমারের অঙ্গে চক্রবর্ত্তী ভূপতির লক্ষণসকল লক্ষিত হইতেছে। করতলে শঙ্খচক্ররেখা, চরণতলে পতাকারেখা, প্রশস্ত-ললাট, দীর্ঘ লোচন, উন্নত নাসিকা, লোহিত অধর, এই সকল চিহ্নদ্বারা মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।"

দশম দিবসে পবিত্র মুহূর্ত্তে কোটি কোটি গাভী ও সুবর্ণ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া ও দীনদুঃখীকে অনেক ধন দিয়া নরপতি পুত্রের নামকরণ করিলেন। পুত্রের নাম চন্দ্রাপীড় রাখিলেন। ক্রমে চূড়াকরণ প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন হইল।

কুমারের ক্রীড়ায় কালক্ষেপ না হয়, এই নিমিত্ত রাজা নগরের

প্রান্তে শিপ্রানদীর তীরে এক বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইলেন। বিদ্যামন্দিরের এক পার্শ্বে অশ্বশালা ও নিম্নে ব্যায়ামশালা প্রস্তুত হইল। চতুর্দ্দিক্ উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত হইল। অশেষ-বিদ্যাপারদর্শী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ অতিযত্নে আনীত ও শিক্ষাপ্রদানে নিয়োজিত হইলেন। নরপতি শুভদিনে চন্দ্রাপীড়কে তাঁহাদিগের নিকট সমর্পণ করিলেন। প্রতিদিন মহিষীর সহিত স্বয়ং বিদ্যমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার এরূপ বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ তাঁহার নব নব বুদ্ধিকৌশলদর্শনে চমৎকৃত ও উৎসাহিত হইয়া সমধিক পরিশ্রমস্বীকারপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনিও অনন্যমনা ও ক্রীড়াশক্তিরহিত হইয়া ক্রমেক্রমে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার হৃদয়দর্পণে সমুদয় কলা সংক্রান্ত হইল। অল্প কালের মধ্যেই শব্দশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, রাজনীতি, ব্যায়াম কৌশল, অস্ত্র ও সঙ্গীতবিদ্যা, সর্ব্বদেশভাষা এবং কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি সমুদায় শিখিলেন। ব্যায়ামপ্রভাবে শরীর এরূপ বলিষ্ঠ হইল যে, করভসকল সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হইলে যেরূপ নড়িতে চড়িতে পারে না, সেইরূপ তিনি ধরিলেও এক পা চলিতে পারিল না। ফলতঃ এরূপ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে, দশ জন বলবান্ পুরুষ যে মুদ্গর তুলিতে পারে না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক ব্যায়াম করিতেন।

এইরূপে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে শৈশবকাল অতীত ও যৌবনকাল সমাগত হইল। চন্দ্রোদয়ে প্রদোষের যেরূপ

রমণীয়তা হয়, গগনমণ্ডলে ইন্দ্রধনু উদিত হইলে বর্ষাকালে যেরূপ শোভা হয়, কুসুমোদ্গমে কল্পপাদপের যেরূপ শ্রী হয়, যৌবনারম্ভে রাজকুমার সেইরূপ পরমরমণীয়তা ধারণ করিলেন। বক্ষঃস্থল বিশাল, উরুযুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, ভুজদ্বয় দীর্ঘ, স্কন্ধদেশ স্থূল এবং স্বর গম্ভীর হইল।

উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা হইলে আচার্য্যেরা বিদ্যালয় হইতে গৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন। তদনুসারে রাজা চন্দ্রাপীড়কে বাটীতে আনাইবার নিমিত্ত শুভ দিনে অনেক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও পদাতি সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া সেনাধ্যক্ষ বলাহককে বিদ্যামন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। বলাহক বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "কুমার! মহারাজ কহিলেন, আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। তুমি সমস্ত শাস্ত্র, সকল কলা ও সমুদায় আয়ুধবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ। এক্ষণে আচার্য্যেরা বাটীতে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। প্রজারা ও পরিজনেরা দেখিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। অতএব আমার অভিলাষ, তুমি অবিলম্বে বাটী আসিয়া দর্শনোৎসুক পরিজনদিগকে দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত কর এবং ব্রাহ্মণদিগের সমাদর, মানীলোকের মানরক্ষা, সন্তানের ন্যায় প্রজাদিগের প্রতিপালন ও বন্ধুবর্গের আনন্দোৎপাদনপূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ কর। আপনার আরোহণের নিমিত্ত মহারাজ ত্রিভুবনের এক অমূল্য-রত্নস্বরূপ, বায়ু ও গরুড়ের ন্যায় অতিবেগগামী, ইন্দ্রায়ুধনামা অপূর্ব্ব ঘোটক প্রেরণ করিয়াছেন। পারস্যদেশের অধিপতি

মহারত্ন ও আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া উহা মহারাজকে উপহার দেন।”

বলাহক এই কথা কহিলে, চন্দ্রাপীড় গম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, “ইন্দ্রায়ুধকে এই স্থানে লইয়া আইস।” আজ্ঞামাত্র অতি বৃহৎ, স্থূলকায়, মহাতেজস্বী, প্রচণ্ডবেগশালী, বলবান্ ইন্দ্রায়ুধ আনীত হইল। ঐ ঘোটক এরূপ বলিষ্ঠ ও তেজস্বী যে, দুই বীর পুরুষ উভয় পার্শ্বে মুখের বল্গা ধরিয়াও উন্নমনের সময় মুখ নিম্ন করিয়া রাখিতে পারে না। এরূপ উচ্চ যে, উন্নত পুরুষেরাও কর প্রসারিত করিয়া পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। চন্দ্রাপীড় সুলক্ষণসম্পন্ন অদ্ভুত অশ্ব অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, “অসুর ও দেবগণ সাগর মন্থন করিয়া কি রত্ন লাভ করিয়াছেন? পিতার কি আধিপত্য! ত্রিভুবনদুর্লভ এতাদৃশ রত্নসকলও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আসনহইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অশ্বের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইলেন। বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে সুললিত মধুর প্রবন্ধে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। ভৃত্যেরা চামর ব্যজন ও মস্তকে ছত্র ধারণ করিল।

চন্দ্রাপীড় ক্রমে নগরের মধ্যবর্ত্তী পথে সমাগত হইলেন। নগরবাসীরা সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকুমারের সুকুমার আকার অবলোকন করিতে লাগিল। নগরস্থ সমস্ত বাটীর দ্বার উদঘাটিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, নগরী চন্দ্রাপীড়কে দেখিবার

নিমিত্ত একেবারে সহস্র সহস্র নেত্র উন্মীলন করিল। চন্দ্রাপীড় নগরে আসিতেছেন শুনিয়া রমণীগণ অতিশয় উৎসুক হইল এবং আপন আপন আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন না করিয়াই, কেহ বা অলক্তক পরিতে পরিতে, কেহ বা কেশ বাঁধিতে বাঁধিতে বাটীর বহির্গত হইয়া, কেহ বা প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া এক দৃষ্টিতে পথ-পানে চাহিয়া রহিল। এক বারে সোপানপরম্পরায় শত শত কামিনীজন অসম্ভ্রমে পাদনিক্ষেপ করায় প্রাসাদমধ্যে এক প্রকার অভুতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভূষনশব্দ সমুৎপন্ন হইল। গবাক্ষজালের নিকট কামিনীগণের মুখপরম্পরা বিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্ত্রীগণের চরণহইতে আর্দ্র অলক্তক পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল পল্লবময় বোধ হইল। তাহাদিগের অঙ্গশোভায় নগর লাবণ্যময়, অলঙ্কারপ্রভায় দিগ্বলয় ইন্দ্রায়ুধময়, মুখমণ্ডলে ও লোচনপরম্পরায় গগনমণ্ডল চন্দ্রময়, পথ নীলোৎপলময় বোধ হইতে লাগিল। রাজকুমার রাজবাটীর সমীপবর্ত্তী হইলে পৌরাঙ্গনারা পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাঁহার মস্তকে মঙ্গলাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল।

ক্রমে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বলাহক অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, শত শত বলবান্ দ্বারপাল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, কোনস্থানে ধনু, বাণ, তরবারি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ অস্ত্রশালা, কোন স্থানে সিংহ, গণ্ডার, করী, করভ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পশুসমাকীর্ণ পশুশালা;

কোন স্থানে নানাদেশীয়, সুলক্ষণ-সম্পন্ন নানাপ্রকার অশ্বে বেষ্টিত মন্দুরা ; কোন স্থানে কুররী, কোকিল, রাজহংস, চাতক, শিখণ্ডী, শুক, শারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণের মধুর কোলাহলে পরিপূর্ণ পক্ষিশালা ; কোন স্থানে বেণু, বীণা, মুরজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রে বিভূষিত সঙ্গীতশালা ; কোন স্থানে বিচিত্রশোভিত চিত্রশালিকা শোভা পাইতেছে। কৃত্রিম ক্রীড়াপর্ব্বত, মনোহর সরোবর, সুরম্য জলযন্ত্র, রমণীয় উপবন স্থানে স্থানে রহিয়াছে। অশেষদেশভাষাজ্ঞ নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক পুরুষেরা ধর্ম্মাধিকরণ-মন্দিরে উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে বিচার করিতেছেন। সমাগত পুরুষেরা বিবিধরত্নাসনভূত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন। কোন স্থানে নর্ত্তকীরা নৃত্য, গায়কেরা সঙ্গীত ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতেছে। জলচর পক্ষীসকল কেলি করিয়া বেড়াইতেছে, বালকবালিকাগণ ময়ূর ও ময়ূরীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। হরিণ ও হরিণীগণ মানুষসমাগমে ত্রস্ত হইয়া ভয়চকিতলোচনে বাটীর চতুর্দ্দিকে দৌড়িতেছে।

অনন্তর ছয় প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া সমস্ত প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মহারাজের আবাসগৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন। অন্তঃপুরপুরন্ধ্রীরা রাজকুমারকে দেখিবামাত্র আনন্দিতমনে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ পরিষ্কৃত শয্যামণ্ডিত পর্য্যঙ্কে নিষণ্ণ আছেন, শরীর-রক্ষাকারী অস্ত্রধারী দ্বারপালেরা সতর্কতাপূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্য করিতেছে ; এমন সময়ে চন্দ্রাপীড় পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। “মহারাজ, অবলোকন করুন,” দ্বারপাল এই

কথা কহিলে, রাজা দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চন্দ্রাপীড়কে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন; করপ্রসারণপূর্ব্বক প্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার স্নেহবিকসিত লোচনহইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল তথায় বসিয়া রাজকুমার জননীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা জননী স্নিগ্ধ ও প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে পুত্রকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ও হস্তদ্বারা গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক আপন উৎসঙ্গদেশে বসাইলেন ও স্নেহসংবলিত মধুরবচনে বলিলেন, "বৎস! তোমাকে নানা বিদ্যায় বিভূষিত দেখিয়া নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হইল।" এই কথা কহিয়া পুত্রের কপোলদেশে চুম্বন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার এইরূপে সমস্ত অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে দর্শন দিয়া আহ্লাদিত করিলেন; পরিশেষে শুকনাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। অমাত্যের ভবনও এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে রাজবাটীহইতে বিভিন্ন বোধ হয় না। শুকনাস সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন। সমাগত সামন্ত ও ভূপতিগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; এমন সময়ে চন্দ্রাপীড় তথায় প্রবেশ করিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমাদরে সম্ভাষণ করিল। শুকনাস রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। পরে রাজনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস চন্দ্রাপীড়! অদ্য তোমাকে কৃতবিদ্য দেখিয়া মহারাজ যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, শত শত সাম্রাজ্যলাভেও তাদৃশ সন্তোষের সম্ভাবনা নাই। আজি

গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ও মহারাজের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ফলিল। আজি কুলদেবতা প্রসন্ন হইলেন। প্রজাগণ কি ধন্য ও পুণ্যবান্‌-যাহাদিগের প্রতিপালনের নিমিত্ত তুমি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছ। বসুমতী কি সৌভাগ্যবতী যিনি পতিভাবে তোমার আরাধনা করিলেন। ভগবান যেরূপ নানা অবতার হইয়া ভূভার বহন করিয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভূভার বহন ও প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর।" রাজকুমার শুকনাসের সভায় ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া তদীয় ভার্য্যার নিকট গমন ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তথাহইতে বাটী আসিয়া স্নান, ভোজন প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মহারাজের আজ্ঞানুসারে শ্রীমণ্ডপনামক প্রাসাদে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শ্রীমণ্ডপের নিকটে ইন্দ্রায়ুধের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

দিবাবসানে দিঙ্মণ্ডল লোহিতবর্ণ হইল, সন্ধ্যারাগে রক্তবর্ণ হইয়া চক্রবাকমিথুন ভিন্ন ভিন্ন দিকে উৎপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, বিরহবেদনা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে তাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে ও গাত্রহইতে রক্তধারা পড়িতেছে। সম্মানিত ব্যক্তিরা বিপদকালেও নীচপদবীতে পদার্পণ করেন না, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত রবি অস্তগমনকালেও পশ্চিমাচলের উন্নত শিখর আশ্রয় করিলেন। দিনকর অস্তগত হইলেন, কিন্তু রজনী সমাগত হয় নাই। এই সময়ে তাপের বিগম ও অন্ধকারের অভ্যুদয় প্রযুক্ত লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হইল। সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের

গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগপূর্ব্বক কমল রূপ নেত্র নিমীলন করিল। বিহঙ্গকুল কোলাহল করিয়া উঠিল। অনন্তর প্রজ্বলিত প্রদীপশিখা ও উজ্জ্বল মণির আলোকে রাজবাটীর তিমির নিরস্ত হইয়া গেল। চন্দ্রাপীড় মাতা-পিতার নিকটে নানা কথাপ্রসঙ্গে ক্ষণকালক্ষেপ করিয়া আহারাদি করিলেন। পরে আপন প্রাসাদে আগমনপূর্ব্বক কোমলশয্যামণ্ডিত পর্য্যঙ্কে সুখে নিদ্রা গেলেন।

প্রভাত হইলে পিতার অনুমতি লইয়া, শিকারী কুকুর, শিক্ষিত হস্তী, বেগগামী অশ্ব ও অসংখ্য অস্ত্রধারী বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বনে প্রবেশ করিলেন;—দেখিলেন, উদারস্বভাব সিংহ সম্রাটের ন্যায় নির্ভয়ে গিরিগুহায় শয়ন করিয়া আছে। হিংস্র শার্দ্দূল ভয়ঙ্কর আকারধারণপূর্ব্বক পশুদিগকে আক্রমণ করিতেছে। মৃগকুল ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া ত্বরিতবেগে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। বন্যহস্তী দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মহিষকুল রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বারা ভয়প্রদর্শন করিয়া নির্ভয়ে বেড়াইতেছে। বরাহ, ভল্লূক, গণ্ডার প্রভৃতির ভীষণ আকার দেখিলে ও চীৎকার শব্দ শুনিলে কলেবর কম্পিত হয়। নিবিড় বন, তথায় সূর্য্যের কিরণ প্রায় প্রবেশ করিতে পারে না। রাজকুমার এতাদৃশ ভীষণ গহনে প্রবেশ করিয়া ভল্ল ও নারাচদ্বারা ভল্লূক, সারঙ্গ, শূকর প্রভৃতি বহুবিধ বন্য পশু মারিয়া ফেলিলেন। কোন কোন পশুকে আঘাত না করিয়া কেবল কৌশলক্রমে ধরিলেন। মৃগয়াবিষয়ে এরূপ

সুশিক্ষিত ছিলেন যে, উড্ডীন বিহগাবলীকেও অবলীলাক্রমে বাণ-বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

বেলা দুই প্রহর হইল। সূর্য্যমণ্ডল ঠিক মস্তকের উপরিভাগ-হইতে অগ্নিময়কিরণ বিস্তার করিল। সূর্য্যের আতপে ও মৃগয়াজন্য শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হওয়াতে রাজকুমারের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মবারিতে পরিপ্লুত হইল। স্বেদার্দ্রশরীরে বিবিধ কুসুমরেণু পতিত হওয়াতে বিন্দু বিন্দু রক্ত লাগাতে যেন অঙ্গে অঙ্গরাগ ও রক্তচন্দন লেপন করিয়াছেন, বোধ হইল। ইন্দ্রায়ুধের মুখে ফেনপুঞ্জ ও শরীরে স্বেদজল বহির্গত হইল। সেই রৌদ্রে স্বহস্তে নব-পল্লবের ছত্র ধরিয়া সমভিব্যাহারী রাজগণের সহিত মৃগয়ার কথা কহিতে কহিতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তুরঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ ও ক্ষণকাল বিশ্রামের পর স্নান করিয়া অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন ও পট্টবসন পরিধানপূর্ব্বক আহার-মণ্ডপে গমন করিলেন। আপনি আহার করিয়া স্বহস্তে ইন্দ্রায়ুধের ভোজনসামগ্রী আনিয়া দিলেন। সে দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল।

কিছু দিন পর রাজা চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার যুবরাজ হইবেন, এই ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজবাটী মহোৎসবময় ও নগর আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত লোকসকল দিগ্‌ দিগন্তে গমন করিল।

একদা কার্য্যচক্রে চন্দ্রাপীড় অমাত্যের বাটীতে গিয়াছিলেন;

তথায় শুকনাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুরবচনে কহিলেন, "কুমার! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদায় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, সকল কলা শিখিয়াছ, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য, সমুদয় জানিয়াছ। তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশ করিলে বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশু-ধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবনপ্রভাবে মনে এক প্রকার তমঃ উপস্থিত হয়, উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থসম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে মত্ততা হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেই রূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ

হলাহলের ঔষধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে; আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ-সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্যে যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকীবৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও আসমুদ্র-সম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয়, এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন, পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানু-গত হয় এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর

কতই প্রশংসা করিয়া থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্তি বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতিদুঃখে লব্ধ ও অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুলশীল কিছুই বিবেচনা করেন না। রূপবান্, গুণবান্, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য পুরুষাধমের আশ্রয় লন। দুরাচার লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে ধনীদিগের নিকট জীবিকালাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্যপরাঙ্মুখ ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দুক বলিয়া অবজ্ঞা করেন; নিকটেও

বসিতে দেন না। তুমি দুরবগাহ নীতিপ্রয়োগ ও দুর্ব্বোধ রাজ্যতন্ত্রের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সাবধান যেন সাধুদিগের উপহাসাস্পদ ও চাটুকারের প্রতারণাস্পদ হইও না। চাটুকারের প্রিয়বচনে তোমার যেন ভ্রান্তি জন্মে না। যথার্থবাদীকে নিন্দুক বলিয়া যেন অবজ্ঞা করিও না। রাজারা আপন চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না এবং এরূপ হতভাগ্য লোক দ্বারা পরিবৃত থাকেন, প্রতারণা করাই যাহাদিগের সম্পূর্ণ মানস। তাহারা প্রভুকে প্রতারণা করিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় ও সর্ব্বদা উহারই চেষ্টা পায়। বাহ্যভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনাদিগের দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটুবচনে প্রভুকে প্রতারিত করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। তুমি সম্ভবতঃ ধীর; তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি, সাবধান, যেন ধন ও যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূভার বহন কর, অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কর এবং সমুদায় দেশ জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর।" এরূপে উপদেশ দিয়া অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাসের গভীর অর্থযুক্ত উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

অভিষেক-সামগ্রী সমাহৃত হইলে অমাত্য ও পুরোহিতের

সহিত রাজা শুভদিনে ও শুভলগ্নে তীর্থ, নদী ও সাগর হইতে আনীত মন্ত্রপূত বারিদ্বারা রাজকুমারের অভিষেক করিলেন। লতা যেরূপ এক বৃক্ষহইতে শাখার দ্বারা বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, সেই রূপ রাজসংক্রান্ত রাজলক্ষ্মী অংশক্রমে যুবরাজকে অবলম্বন করিলেন। পবিত্র তীর্থজলে স্নান করিয়া রাজকুমার উজ্জ্বল শ্রীপ্রাপ্ত হইলেন। অভিষেকান্তর ধবল বসন ও উজ্জ্বল ভূষণ ও মনোহর মাল্য ধারণপূর্ব্বক অঙ্গে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। অনন্তর সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক শশধর যেরূপ সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ করিলে শোভা হয়, যুবরাজ সেইরূপ রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভার পরম শোভা সম্পাদন করিলেন। নব নব উপায়দ্বারা প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও রাজ্যের সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া পরমসুখে যৌবরাজ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজাও পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন (সংক্ষিপ্ত।)

পরিশ্রম।

মনুষ্যেরা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্নসম্ভূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাবজাত বাসস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে নিজ যত্নে ঐ সমুদায় উৎপাদন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়। জগদীশ্বর যেমন ঐ সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্য

বস্তুসমুদায় তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, মনুষ্য আপনার শরীর ও মন পরিচালনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন। তিনি এই অশেষ কল্যাণকর অনুমতি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বোধ করেন,কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা কেবল ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিতপুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্তরঞ্জন পণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণী, তড়িৎ-সম বেগ-বিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্ম-শাসন সংস্থাপক পবিত্র বিচার-স্থান, জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকর স্বরূপ বিদ্যামন্দির পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান-সমষ্টিস্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদায় শুভঙ্কর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমা পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে। পরিশ্রম যে পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা বিবেচক লোকেরা সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার আলস্যের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম যে কেবল পরিণামেই সুখোৎপাদক এমন নহে, কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে। শরীর চালনায় যে কিরূপ দুর্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্ট-রূপে অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির থাকিতে ভালবাসে না;

গমন, ধাবন, কুর্দ্দন করিতে পারিলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যাঁহারা প্রতি দিবস সাত আট ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনা পরিশ্রমে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়। শরীরসঞ্চালন না করিলে, পীড়িত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন যে তাহাতে অঙ্গসঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্যবিধ অঙ্গচালন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক, নতুবা মনোবৃত্তিসমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে সুতরাং তেজস্বিনী মনোবৃত্তি পরিচালনদ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় সুখের উৎপত্তি হয় তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখসলিলের এক একটী পবিত্র প্রস্রবণ-স্বরূপ। তাহাদিগকে যথাবিধানে চালনা করিয়া যত সতেজ করা যায়, ততই প্রবল সুখ-ধারা উৎপাদিত হইতে থাকে। অতএব পরিশ্রম যে আবশ্যক ও বিধেয় ইহা আমাদিগের প্রকৃতিপটে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ শারীরিক কর্ম্মকে নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, তাঁহারা লোক-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী আবশ্যক হিতকারী কর্ম্ম ক্লেশকর অপকৃষ্ট কর্ম্ম বিবেচনা করেন, আর অনাবশ্যক অলীক কার্য্যসমুদায় ভদ্রলোকের অনুষ্ঠানযোগ্য সুখদায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম ইতর বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু

মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পশু বধ করা সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত লোকের অযোগ্য বিবেচনা করেন না। "ভদ্র" এই আখ্যা-ধারী মহাশয়েরা যৎসামান্য জলাশয়তটে উপবিষ্ট ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া এবং দুঃসহ চাকচিক্যময় জলপুঞ্জোপরি প্লবমান শ্বেতবর্ণ তরঙ্গের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া অশেষবিধ নিষ্ঠুরাচরণ সহকারে প্রাণি-হিংসা করাকে আপনাদের উপযুক্ত কর্ম্ম বোধ করেন। কিন্তু জন-সমাজের উপকার অত্যাবশ্যক কর্ম্মসমুদায় কেবল কষ্টদায়ক নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন। যে সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তখন তাঁহাকে উচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরবরক্ষা করিতে দৃষ্টি করা যায়, আর যখন তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল প্রবল হইয়া উঠে, তখন পশুবৎ নিকৃষ্ট ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া, নিকৃষ্টজীবের ভাব গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু অবিবেচক অদূরদর্শী মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অনিষ্টকর কুসংস্কার করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত নহে। যখন আমাদের লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তখন তাহা কোন ক্রমেই ঘৃণার বিষয় নয়। যাহা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূল, তাহাই নিন্দনীয়। তাঁহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসায় আদরণীয় ব্যতিরেকে কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না।

যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় এবং অন্যের

উপাসনা তুচ্ছ করিয়া, স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় পরম পবিত্র ধর্ম্ম। স্বহস্তে হলচালনা করা দূষ্য নহে, করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে। এতদ্দেশীয় বিষয়ী লোক, যে সমস্ত ঔপাধিক লাভ-দায়িকা অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জানেন, সে সমুদায়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। ন্যায় পথাশ্রমী সরল-স্বভাব কৃষক, অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্র গুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দ-বিশিষ্ট পবিত্র পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্বরথ শোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদ-শ্রেণীও মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজুস্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলীপত্রস্থিত নিরুপকরণ তণ্ডুলগ্রাস, পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণপাত্রারূঢ় সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্র গুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর। বহুকালাবধি এ দেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ন্যায় বিরুদ্ধ কুৎসিত কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিবেন, পরোপজীব্য অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন, অনাহারে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিবেন তথাচ ঈশ্বরানুমত, ধর্ম্মানুগত, শিল্পকর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না।

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োজনক ও সুখজনক বটে, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক লোকে নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, জনসমাজে এ বিষয়ে অতিশয় অব্যবস্থা

দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা প্রতি দিবস ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ দণ্ড কর্ম্ম করিয়া কষ্টেস্হষ্টে দিনপাত করিতেছে, কেহ বা চারি দণ্ড কালও নিয়মিত পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত নহে। কিন্তু এই উভয়ই অনিষ্টকর। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়; সুতরাং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিসকলও তেজোহীন হইতে থাকে। মনুষ্য কেবল এরূপ করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিবেন, ইহা কদাচ পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার শুভকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব প্রতি দিবস তৎসমুদায় সঞ্চালন করিয়া শরীর ও মন, সুস্থ ও সতেজ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিবসই জীবিকা নির্ব্বাহে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পবিত্র প্রমোদ সম্ভোগে যাপন করা বিধেয়।

যে জনসমাজে ইন্দ্রিয় পরায়ণ ভোগবিলাসী ব্যক্তিরা সংসারের কোন প্রকার উপকার না করিয়া, স্তূপাকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী ভোগ করিতেছেন এবং নির্ধন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সেবা-সমাধার্থ প্রতিদিন ত্রিশ চল্লিশ দণ্ড পরিশ্রম করিয়া, শরীরপাত করিতেছে, তাহার ব্যবস্থা প্রণালীর কোন স্থানে না কোন স্থানে কোন প্রকার দোষ অবশ্যই প্রবিষ্ট আছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে কেবল ক্লেশ ও নিদ্রা এই দুই বিষয়ের সেবা করে। তাহাদের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। অন্য অন্য শিল্পযন্ত্রের ন্যায় তাহাদিগকেও এক একটী যন্ত্র

বলিলে, বলা যায়। যদি জ্ঞানবৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি করাই মনুষ্যের প্রধান কল্প হয়, তাহা হইলে জন-সমাজে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। আহার পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন কিঞ্চিৎকাল কর্ম্ম করা আবশ্যক বটে, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত, যে প্রমাণ ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রয়োজনীয়, তাহা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না। মনুষ্যেরা আপনাদের অতি প্রবল ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ অনাবশ্যক দ্রব্যও আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সমুদায় আহরণার্থ ভোগাভিলাষীদিগকেও অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় এবং যাহারা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। যদি লোকে ঐ সমস্ত নিষ্প্রয়োজন দ্রব্য লাভের অভিলাষ পরিত্যাগ করে এবং সকলে প্রতিদিবস ন্যূনাধিক এক প্রহর কাল পরিশ্রম করে, তাহা হইলে সুখস্বচ্ছন্দে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করা উচিত এবং যে সমস্ত জীব সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের স্বীয় সমাজের কোন না কোন প্রকার হিতকারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা বিধেয়, এই কল্যাণকর নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়। জগৎপিতা জগদীশ্বর, যাবতীয় জন্তুকে তাহাদের

নির্ব্বাহোপযোগী সামর্থ্য দিয়াছেন। সকল সিংহই, আপন আহার অন্বেষণ করে এবং প্রত্যেক বীরই নিজ নিকেতন নির্ম্মাণ-বিষয়ে সহায়তা করে। যে সকল জীব, শ্রেণীভুক্ত হইয়া, এক এক শ্রেণী এক এক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে একটিও বিনা পরিশ্রমে কালহরণ করে না, সুতরাং অন্যদীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি মধুত্থ আহরণ করে, অপর কতকগুলি মধুক্রম নির্ম্মাণ করে, অবশিষ্ট কতকগুলি মধু সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কি দুঃখের বিষয়! মনুষ্যেরা এই সমস্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াও, পরমেশ্বরের স্পষ্টাভিপ্রায় অবগত হন না এবং আপন প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াও, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীত হয়, উল্লিখিত ভোগবিলাসী মহাশয়দিগের এবং পরোপজীবী নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, তাহাদের পোষণার্থ অপর ব্যক্তিদিগকে তত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুরূপ কর্ম্ম করিলে, সকলের ভারের লাঘব হয়। কিন্তু কেবল স্বহস্তে হল চালান ও খনিত্র, ব্যবহার করিলে, সংসারের উপকার করা হয় না, এমত নয়। ধনশালী মহাশয়েরা, আপনাদের অর্থব্যয় ও বুদ্ধিপরিচালন করিয়া, সহস্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের এই উভয় উপায়দ্বারা জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম, উভয়ই হিতকারী। যাঁহারা বুদ্ধিবলে নূতন

শিল্পযন্ত্র প্রস্তুত ও তৎসম্বন্ধীয় কোন অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের মহোপকারী মহাশয় মনুষ্য। যাঁহারা বাচনিক উপদেশ অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া, লোকের ভ্রম নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা ভূলোকের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন উষাকালের সুকুমার অরুণপ্রভা, পূর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইয়া, উত্তরোত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ সমস্ত মহানুভব মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রভাব ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়া থাকে।

ধনশালী মহাশয়েরা যে, স্বীয় ভোগাভিলাষ খর্ব্ব করিয়া জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না, এটি তাঁহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের অতিমাত্র উত্তেজনারই কার্য্য। ইহাকে তাঁহাদের অত্যন্ত অযশস্কর অধর্ম্মের মধ্যে গণিত করিতে হয়। তাঁহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসমুদায় প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিকটে পরাভূত হইয়াছে রহিয়াছে। এ দেশীয় ধনবান ব্যক্তিরা, অনেকেই যাদৃশ অলীক ব্যাপারে অর্থব্যয় করেন এবং যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা স্মরণ হইলে, দুঃসহ দুঃখ-তাপে তাপিত হইতে হয় এবং একবারে স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বজাতীয় লোককে ধিক্কার দিতে হয়।

(৺অক্ষয়কুমার দত্ত।)

বল্মীক।

পুত্তিকা-নামক কীট বাস-স্থান-নির্ম্মাণ-বিষয়ে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রায় অন্য কোন ইতর প্রাণী সেরূপ পারে না। তাহাদের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহাদের বাসগৃহ বল্মীক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

পুত্তিকা নানাপ্রকার, তন্মধ্যে এ স্থানে যে প্রকার পুত্তিকার বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইতেছে তাহার নাম সামরিক পুত্তিকা।

সামরিক পুত্তিকা আফ্রিকাখণ্ডে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল সামরিক পুত্তিকা বল্মীক প্রস্তুত করে, তাহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য এক বুরুলের চতুর্থাংশ অপেক্ষা ন্যূন, কিন্তু তাহাদের নির্ম্মিত বাস-গৃহ সচরাচর সাত আট হাত উচ্চ হয়। অনেক অনেক বল্মীক তদপেক্ষাও উন্নত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সমস্ত বল্মীক, পুত্তিকাগণের শরীর অপেক্ষা যত গুণ উচ্চ, মনুষ্যেরা এ পর্য্যন্ত নিজ দেহ অপেক্ষা তত গুণ উচ্চ অট্টালিকা, মন্দির, স্তম্ভাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। সেনেগেল নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী কোন কোন স্থানে একত্র এত বল্মীক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, যেন সেই সেই স্থানে এক এক খান গ্রাম বসিয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত বল্মীকসকল যেমন উন্নত, উহার নির্ম্মাণপরিপাটীও তদনুরূপ। উহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেখিলে, সামরিক পুত্তিকাদিগের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ

করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের সুন্দররূপ আহার-বিহার সম্পাদনার্থ বাসগৃহের যেরূপ শৃঙ্খলা আবশ্যক, তাহারা তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। রাজপ্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশু-শালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি অতি পরিপাটীক্রমে প্রস্তুত করে। প্রকোষ্ঠসকল খিলান করা। এক প্রকোষ্ঠহইতে অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করিবার নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত থাকে। এক প্রদেশহইতে অন্য প্রদেশে গমন করিতে হইলে যে যে স্থলে কুটিল পথদিয়া অনেক বেস্টন করিয়া গমন করিতে হয়, তাহারা সেই সেই স্থলে এক এক খিলান করা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া রাখে। এইরূপে তাহারা আপনাদের আবাস-বাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিতি করে। উহা এমন দৃঢ় ও কঠিন যে, চারিপাঁচ জন মনুষ্য, উহার উপর দণ্ডায়মান হইলেও, ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

সামরিক পুত্তিকাদিগের কার্য্য-প্রণালীও অতি সুন্দর। ঐ প্রণালী এমত পরিপাটী যে উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালা বলিলেও বলা যায়। ইহারা তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট, শ্রামিক পুত্তিকা, সৈনিক পুত্তিকা ও বিশিষ্ট পুত্তিকা। শ্রামিক পুত্তিকারা গৃহ, পথ, সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত করে। সৈনিক পুত্তিকারা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনানুসারে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের শরীর শ্রামিক পুত্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষায় প্রায় পনর গুণ বড়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রামিক পুত্তিকারা কখনও সৈনিক পুত্তিকার

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না এবং সৈনিক পুত্তিকারাও কদাচ শ্রামিক পুত্তিকার কার্য্যে নিযুক্ত হয় না। বিশিষ্ট পুত্তিকারা না গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, না যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও সমর্থ নয়। কিন্তু তাহাদের কলেবর সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট এবং অঙ্গে পালক উঠিয়া থাকে। তাহাদের দেহ, সৈনিক পুত্তিকাদিগের দ্বিগুণ ও শ্রামিক পুত্তিকাদিগের শরীরের ত্রিশ গুণ। অন্য অন্য পুত্তিকারা তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মান্য করে ও প্রধান পদে অধিরূঢ় করিয়া রাখে। তাহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইবার পর কয়েক সপ্তাহমধ্যেই উড্ডীয়মান হইয়া অন্যত্র গমন করে। কিন্তু উড়িবার কিঞ্চিৎকাল পরেই পালকসকল খসিয়া পড়ে। তখন পক্ষীপতঙ্গাদি আসিয়া, তাহাদিগকে আহার করে। কত শতটা বা নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে পতিত হয়। আফ্রিকানিবাসীরা তাহাদিগকে ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করে।

পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে বল্মীকের কোন স্থান ভগ্ন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ একটি সৈনিক পুত্তিকা সেই ভগ্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনতিবিলম্বে আর দুই তিনটী আগমন করে। তদনন্তর ভূরি ভূরি পুত্তিকা বাহির হইতে থাকে। এইরূপ যতক্ষণ বল্মীকের উপর আঘাত করা যায় ততক্ষণ সৈনিক পুত্তিকাসকল বহির্গত হয় এবং ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া একপ্রকার শব্দ করিতে থাকে; তাহারা আততায়ীকে আক্রমণ করে, দংশন করে ও দূরীভূত

করিয়া দিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করে; কিন্তু বল্মীকের উপর আঘাত করিতে নিরস্ত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর সহস্র সহস্র শ্রামিক পুত্তিকা বাহির হইয়া, ঐ ভগ্ন স্থান পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লক্ষ লক্ষ পুত্তিকা একত্র কর্ম্ম করিতে থাকে, অথচ কেহ কাহারও কর্ম্মে ব্যাঘাত্ জন্মায় না এবং এক নিমিষের নিমিত্তও নিজ কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হয় না। এক একটা সৈনিক পুত্তিকা, এক এক দল শ্রামিক পুত্তিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বোধ হয়, তাহার অধ্যক্ষ বা প্রহরীরস্বরূপ হইয়া তত্ত্বাবধারণ করে। বিশেষতঃ একটা সৈনিক পুত্তিকা ভগ্ন স্থানের অতি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে, সে এক এক বার শব্দ করে, আর শ্রামিক পুত্তিকারা তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে আর এক প্রকার শব্দ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্বরান্বিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে।

মানবগণ প্রবল বুদ্ধি-বল সত্ত্বেও যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হন, এই সকল ক্ষুদ্র কীট, কিরূপে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করে তাহা আমাদের বুদ্ধির গম্য নহে। কিন্তু যে বিচিত্র-শক্তি বিশ্বকারণ মনুষ্যকে অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি অপরাপর প্রাণীকেও তাদৃশ শক্তি প্রদান করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও মহিমা অপার!

(৺অক্ষয়কুমার দত্ত।)

টেলিমেকস।

উপক্রমণিকা।

টেলিমেকস গ্রীসদেশীয় ইউলিসিসের পুত্র। গ্রীসদেশীয় নরপতিগণ ট্রয় নগর আক্রমণ করেন। দশবার্ষিক সংগ্রামের পর ট্রয় নগর নিপাতিত ও ভস্মাবশেষীকৃত হয়। এই দীর্ঘকালীন সংগ্রামে গ্রীসদেশীয় অনেক রাজা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; অবশিষ্টেরা হতাবশিষ্ট স্ব স্ব সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বহুকাল অতীত হইল, ইউলিসিস্ প্রত্যাগমন করিলেন না। ইউলিসিসের পুত্র টেলিমেকস সাতিশয় পিতৃপরায়ণ ছিলেন। তিনি পিতার অনাগমনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ট্রয়হইতে প্রত্যাগত নরপতিদিগের নিকট তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি নিতান্ত কাতর ও একান্ত অধৈর্য্য হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ নির্গত হইলেন। মিনর্ব্বাদেবী ইউলিসিস্ ও তাঁহার পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; টেলিমেকস অতি অল্পবয়স্ক, পিতার অন্বেষণে নির্গত হইলে নানাস্থানে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা আছে এজন্য তিনি তাঁহার এই উদ্যম নিবারণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন; কিন্তু দেবীর আকারে আবির্ভূত না হইয়া, ইউলিসিসের মেণ্টর নামে যে এক পরম বন্ধু ছিলেন, তদীয় আকার অবলম্বন পূর্ব্বক টেলিমেকসের নিকটে আগমন করিলেন এবং তাঁহার পিতৃ-অন্বেষণে নির্গত হওয়া যে অত্যন্ত অসংসাহসিকতা ও যার পর নাই অবিমৃশ্যকারিতার কর্ম্ম হইতেছে ইহা নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু পিতৃ-বৎসল টেলিমেকস কোনও মতেই নিবৃত্ত হইলেন না। অনন্তর মেণ্টর-রূপধারিণী মিনর্ব্বা দেবী স্নেহবশীভূতা হইয়া সহচরভাবে তৎসমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। নিম্নে টেলিমেকসের পিতৃঅন্বেষণে ভ্রমণবৃত্তান্তের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

যে সকল গ্রীক রাজারা ট্রয়নগরীর সংগ্রাম হইতে অপসৃত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট পিতৃ-বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমি ইথাকা হইতে বহির্গত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে, পিতার প্রতিগমনবিলম্ব দর্শনে তদীয়

অস্মুদ্দেশবার্ত্তা প্রচার করিয়া দিয়া, অনেকে আমার জননীর পাণিগ্রহণাভিলাষে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা আমার এই আকস্মিক প্রস্থান দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল; কারণ তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক ও প্রবঞ্চক জানিয়া তাহাদের নিকট আমি আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই। আমি প্রথমতঃ অনেকের নিকট গমন করিলাম; কিন্তু পিতা জীবিত আছেন কি মরিয়াছেন, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। চিরকাল সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকা অতিশয় ক্লেশাবহ বিবেচনা করিয়া পরিশেষে আমি সিসিলিদ্বীপগমনে স্থিরনিশ্চয় হইলাম; কারণ এই জনরব শ্রবণ করিলাম যে পিতা প্রতিকূল-বায়ুবশে তথায় নীত হইয়াছেন। কিন্তু আমার সহচর ও আমার সুখ-দুঃখভাগী পরম বিজ্ঞ মেণ্টর ইহা কহিয়া এই দুঃসাহসিক ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন যে, তথায় সাইক্লপ্‌স নামে নরমাংসাশী রাক্ষসেরা বাস করে এবং ইনীয়স প্রভৃতি ট্রোজনেরাও গমনাগমন করিয়া থাকে; তথায় যাইতে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ট্রোজনেরা সমুদায় গ্রীকজাতির উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়া আছে, বিশেষতঃ ইউলিসিসের উপর; তুমি তাঁহার সন্তান, তোমাকে পাইলে তাহারা নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিবেক। অতএব আমার উপদেশ শুন, স্বদেশে ফিরিয়া চল। তোমার পিতা দেবতাদিগের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; তিনি কখনও বিপদে পড়িবেন না; হয় ত এতদিন ইথাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু যদি নিয়তিক্রমে তিনি পরলোকযাত্রাই করিয়া থাকেন, আর কখনও তোমাদের

মুখাবলোকন করিতে না পান,তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি গৃহপ্রতিগমন করিয়া পিতার অবমাননাকারীদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর; জননীকে বিবাহার্থী দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত কর; পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিদিগকে বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন কর; আব যাবতীয় গ্রীকেরাও দেখুক যে, টেলিমেকস সর্ব্বাংশে পিতৃসিংহাসং◌ের যোগ্য।

তিনি আমাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ বিস্তর বুঝাইলেন, আমি দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হইয়া তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে, আমার এইরূপ অবাধ্যতা অবিমৃশ্যকারিতা দেখিয়াও অবিরক্তচিত্তে আমার সহিত সিসিলি যাত্রা করিলেন। আর আমি যে এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহা দেবতাদিগের অভিমত; হয়ত তাঁহারা ইহা ভাবিয়াছিলেন যে অবিমৃশ্য-কারিতাদোষে আমার যে সকল দুরবস্থা ঘটিবেক, তদ্দারা আমি জ্ঞানশিক্ষা পাইব।

আমরা কিয়ৎক্ষণ অনুকূল বায়ু সহকারে সিসিলিদ্বীপাভিমুখে গমন করিলাম; কিন্তু অকস্মাৎ বাত্যা উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আমরা বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দেখিতে পাইলাম আরও কয়েকখান পোত আমাদিগের পোতের ন্যায় বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। অবিলম্বেই জানিতে পারিলাম, সে সমুদায় ট্রোজন-দিগের সংগ্রামপোত। তখন আমি প্রাণবিনাশশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলাম। ঔদ্ধত্যবশতঃ প্রথমে আমি যে সম্যক বিবেচনা

করিয়াই এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এরূপ জ্ঞান আর তখন কোনও কার্য্যকারক হইতে পারে না। এই বিষম সঙ্কটে মেণ্টরকে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা উদ্বিগ্ন বোধ হইল না, বরং স্বভাবতঃ যেরূপ অকুতোভয় ও প্রফুল্লহৃদয় সেই সময় তদপেক্ষাও অধিক দৃষ্ট হইল। তিনি আমাকে অশেষ প্রকারে সাহস দিতে লাগিলেন। তদীয় বাক্য শ্রবণে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন কোনও অনির্ব্বচনীয় শক্তিপ্রভাবে আমার অন্তঃকরণ সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তদনন্তর, তৎকালে যেরূপে অর্ণবপোত চালিত করিলে প্রাণরক্ষা হইতে পারে, তিনি অবিচলিতচিত্তে কর্ণধারকে তদনুরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি ভীত ও ব্যাকুল হইয়া একবারে কার্য্যাক্ষম হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমি মেণ্টরকে কহিতে লাগিলাম, হায়! কেন তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম? মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর আর কি ঘটিতে পারে যে, অদ্যাপি উহাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের কোনও বিষয়েই কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান বা অধিকার জন্মে নাই, অথচ আত্মবিবেচনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকে। যদি এবার প্রাণরক্ষা হয়, আপনি আপনাকে বিষম শত্রু বোধ করিব, কেবল তোমাকে একমাত্র মিত্র স্থির করিয়া আর কখনও তোমার বাক্য অবহেলন করিব না।

মেণ্টর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছ তন্নিমিত্ত আমার তোমাকে ভৎর্সনা করিবার অভিলাষ নাই; যদি

কুকর্ম্ম বলিয়া তোমার বোধ হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার তাঁদৃশ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হও, তাহা হইলেই ইষ্টসিদ্ধি হইল। কিন্তু বিপদ অতিক্রান্ত হইলে পর হয় ত, তুমি পুনর্ব্বার ঔদ্ধত্যদোষে লিপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, এক্ষণে সাহস ভিন্ন পরিত্রাণের উপায় নাই। বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে বিপদকে ভয়ানক জ্ঞান করা উচিত; কিন্তু বিপদ ঘটিলে অকুতোভয়ে ও অব্যাকুলিতচিত্তে তৎপ্রতিবিধানে তৎপর হওয়া আবশ্যক; সে সময়ে ভয়ে অভিভূত হওয়াই কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব পিতার উপযুক্ত পুত্র হও, উপস্থিত বিপদে অক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া পরিত্রাণের উপায় চিন্তা কর। মেণ্টরের সরলতা ও মহানুভবতা দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম; কিন্তু যে উপায়ে তিনি আমাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন, তাহা দেখিয়া একবারে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গগনমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, অকস্মাৎ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। ট্রোজনেরা অত্যন্ত সন্নিহিত ছিল, সুতরাং দেখিবামাত্র তাহারা আমাদিগকে গ্রীকজাতি বলিয়া চিনিতে পারিত এবং তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ আমাদিগের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইত। এই সময়ে মেণ্টর দেখিতে পাইলেন, তাহাদের এক খানি নৌকা বায়ুবেগবশাৎ কিঞ্চিদ্দূরে পড়িয়াছে। ঐ নৌকা প্রায় সর্ব্বাংশেই আমাদিগের নৌকার তুল্য, কেবল তাহার পশ্চাদ্ভাগ কুসুমমালায় সুশোভিত এই মাত্র বিশেষ। ইহা লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে তিনি আমাদিগের নৌকার সেই স্থানে সেইরূপ মালা সেইরূপ রজ্জু দ্বারা স্বয়ং বন্ধন করিলেন এবং নাবিকদিগকে

কহিয়া দিলেন, তোমরা সম্পূর্ণ শক্তি সহকারে ক্ষেপণী ক্ষেপণ কর, তাহা হইলে, বিপক্ষেরা আমাদিগকে গ্রীক বলিয়া চিনিতে পারিবে না। এইরূপে তিনি বিপক্ষগণের মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনিবার্য্য বায়ুবেগবশতঃ আমাদিগকে কিয়ৎক্ষণ অগত্যা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল; পরিশেষে আমরা কৌশলক্রমে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলাম। তাহারা প্রবল বায়ুবেগে আফ্রিকাভিমুখে নীত হইল, আমরাও সন্নিহিত সিসিলিদ্বীপ প্রাপ্তির আশয়ে যৎপরোনাস্তি আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে নৌকা চালাইতে লাগিলাম।

আমাদিগের এই আয়াস ও পরিশ্রম সফল হইল বটে, কিন্তু বিপক্ষগণকে ভয়ানক বোধ করিয়া তাহাদিগের সঙ্গপরিহারার্থ আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, ঐ স্থান তদপেক্ষা কোনও ক্রমেই অল্প ভীষণ নহে। আমরা দেখিলাম, অন্যান্য ট্রোজনেরাও ট্রয় নগর হইতে পলাইয়া আসিয়া ট্রোজনজাতীয়, সিসিলিপতি এসেষ্টিসের অধিকারে বাস করিয়া আছে। আমরা এই দ্বীপে উত্তীর্ণ হইবামাত্র ঐ সকল ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিয়া কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ আমাদের নৌকা ভস্মাবশেষ করিয়া আমাদিগের অনুচরগণের প্রাণবধ করিল এবং তাহাদিগের রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসিয়া আমাদের নাম, ধাম ও অভিসন্ধি অবগত হইতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক আমাকে ও মেণ্টরকে নগরে লইয়া চলিল। বোধ হয়, তাহারা মনে করিয়াছিল আমরা ঐ দ্বীপেরই অন্য কোনও অংশ নিবাসী, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া

তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছি। অথবা দেশান্তরীয় শত্রু, তাহাদিগের দেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছি। যাহা হউক, তৎকালে আমরা এই স্থির করিয়াছিলাম রাজা আমাদিগের পরিচয় লইয়া গ্রীকজাতি বলিয়া অবগত হইলেই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিবেন।

রাজা এসেষ্টিস সুবর্ণদণ্ড ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে আমরা তৎসমীপে উপস্থিত হইলাম। রাজা আমাদিগকে দেখিবামাত্র কর্কশ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ দেশ নিবাসী, আর তোমাদের এখানে আসিবার প্রয়োজনই বা কি ? মেণ্টর অবিলম্বে উত্তর করিলেন, আমরা বৃহৎ হেস্পারিয়ার উপকূল হইতে আসিয়াছি ; তথা হইতে আমাদের নিবাসভূমি অধিক দূর নহে। আমরা যে গ্রীকজাতি তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি এইরূপ কৌশলক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন। এসেষ্টিস কোনও কথাই শুনিলেন না। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমরা বিদেশীয় লোক, কোনও অসদভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত তদীয় অধিকারে উপস্থিত হইয়াছি এবং সেই অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখিতেছি। এই নিমিত্ত তিনি আমাদিগের প্রতি আদেশ করিলেন যে, সন্নিহিত অরণ্যে গমন করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পশুরক্ষকদিগের অধীনে থাকিয়া দাসত্ব করিতে হইবেক। ঈদৃশ হীন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে মরণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর এই বিবেচনা করিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলাম,

রাজন! যার পর নাই অপমানজনক দণ্ড বিধান না করিয়া বরং আমাদের প্রাণবধ করুন। মহারাজ! আমি আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি অবধান করুন; আমি ইথাকাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ইউলিসিসের পুত্র, আমার নাম টেলিমেকস। আমি অনুদ্দিষ্ট পিতার অন্বেষণার্থ নির্গত হইয়াছি; প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যাবৎ তাঁহার দর্শন না পাইব তাবৎ দেশ বিদেশ পর্য্যটনে ক্ষান্ত হইব না। কিন্তু যদি আমি অতঃপর অভিপ্রেত সাধনের উপায় করিতে না পাই, যদি আর কখনও আমার স্বদেশ প্রতিগমনের আশা না থাকে, আর যদি দাসত্বস্বীকার ব্যতিরিক্ত কোনও ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে না পাই, তাহা হইলে, আমার প্রাণবধ করিয়া এই দুর্ব্বহ দেহভার হইতে মুক্ত করুন।

এই বাক্য শ্রবণমাত্র তত্রস্থ সমুদায় ব্যক্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নরপতির নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে ইউলিসিসের ধূর্ত্ততা ও নির্দ্দয়তা-নিবন্ধন ট্রয় নগর ধ্বংস হইয়াছে অবশ্যই তাহার পুত্রের প্রাণবধ করিতে হইবেক। তখন রাজা আমাকে সরোষ নয়নে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, অহে ইউলিসিসের পুত্র! তোমার পিতা একিরন নদীতীরে যে সকল ট্রোজনের প্রাণসংহার করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার শোণিত দ্বারা তাহাদিগের প্রেতগণকে পরিতুষ্ট করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইয়াছে, আমি তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই ক্ষান্ত হইতে পারি না। তোমাকে ও তোমার সহচরকে অবশ্যই প্রাণদণ্ড দিতে হইবেক। এই সময়ে এক বৃদ্ধ রাজসমীপে প্রস্তাব করিল যে, ইহাদিগকে এঙ্কাইসিসের সমাধি-

মন্দিরের উপর বলিদান দেওয়া যাউক ; ঐ বীর পুরুষের প্রেত ইহাদিগের শোণিত দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবেক এবং ইনীয়সও এই ব্যাপার অবগত হইয়া তদীয় প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে আপনকার এতাদৃশ আগ্রহ ও যত্ন দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র সমুদায় লোক সেই বৃদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করত কোলাহল ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং অবিলম্বে তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইল। কিঞ্চিৎ পরেই তাহারা আমাদিগের বধ্যবেশ সমাধান করিয়া এঙ্কাইসিসের সমাধিমন্দিরে লইয়া গেল। দেখিলাম তথায় দুই বেদী প্রস্তুত রহিয়াছে। অনন্তর যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিল ; বলিদানের খড়গ সম্মুখে স্থাপিত হইল। এই বিষয়ে তাহাদিগের এমন উৎকট আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, আমাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্রও কারুণ্যসঞ্চার হইল না।

দেখিয়া শুনিয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল হইলাম ; কিন্তু মেণ্টর এরূপ বিষম সময়েও, যেন কোনও বিপদই উপস্থিত হয় নাই, এইরূপ ভাবে নির্ভয়তা ও প্রশান্তচিত্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! টেলিমেকসের অদ্যাপি শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই, ইনি কখনও ট্রোজনদিগের বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অস্ত্র ধারণ করেন নাই। যাহা হউক, যদিও ইঁহার দুরবস্থা দর্শনে তোমার অন্তঃকরণে কারুণ্যের উদয় না হয়, অন্ততঃ তোমার নিজের যে বিষম বিপদ উপস্থিত, তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া অকারণে আমাদের

প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছ, কিন্তু আমি তোমাকে তোমার আসন্ন বিপদের বিষয় সতর্ক না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমার এক অসাধারণ বিদ্যা আছে; ঐ বিদ্যার প্রভাবে আমি কালত্রয়ের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি। দেবতারা তোমার উপর অতিশয় রুষ্ট হইয়াছেন। যদি তুমি সময়ে সাবধান হইতে না পার, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবেক। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তিন দিনের মধ্যে এক অসভ্য জাতি প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া তোমার নগরলুণ্ঠন, প্রজাবিনাশ প্রভৃতি অশেষ অহিতাচার করিবেক; অতএব এই উপস্থিত বিপদের নিবারণে সত্বর ও যত্নবান হও, প্রজাগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত কর এবং এই সময়ে জনপদস্থ যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্য আনিয়া নগরমধ্যে নিবেশিত কর। তিন দিবস অতীত হইতে দাও; যদি আমার এই ভবিষ্যসূচনা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, এই বেদীর উপর আমাদিগকে বলিদান দিবে; কিন্তু যদি উহা সত্য হয়, তাহা হইলে, বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদিগের দ্বারা তোমার কি মহোপকার লাভ হইল। তখন তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, আমাদিগের হইতেই তোমার ধন মান প্রাণ রক্ষা হইল; তখন বিচারসিদ্ধ হয়, আমাদের প্রাণদণ্ড করিও।

মেণ্টার এরূপ অবিচলিতচিত্তে ও দৃঢ়তাসহকারে এই কথাগুলি বলিলেন যে, শ্রবণ মাত্র এসিষ্টিসের অন্তঃকরণে তদীয় ভবিষ্যসূচনার যথার্থতাবিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় রহিল না। তখন তিনি একেবারে হতাশ হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে কহিতে লাগিলেন,

অহে বিদেশীয় মহাপুরুষ ! দেবতারা তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য অথবা সাম্রাজ্যপদ প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তোমাকে যে লোকাতীত জ্ঞানরত্নে মণ্ডিত করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনা করিলে ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্য অতি তুচ্ছ। বুঝিলাম, তুমি সামান্য মানব নহ ; কেবল আমার পরিত্রাণের নিমিত্তই এই দ্বীপে উপনীত হইয়াছ। অতএব কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ ও দুর্বিনীততা মার্জ্জনা কর। এই বলিয়া বলি প্রদানের অনুষ্ঠান সকল স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং অবিলম্বে মেণ্টর নির্দ্দিষ্ট আক্রমণের নিবারণজন্য সজ্জীভূত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে অতি বিপুল কোলাহল উঠিল ; দৃষ্ট হইল, ভয়কম্পিত নারীগণ ও জরাজীর্ণ পুরুষগণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ; বালকেরা অশ্রুমুখে জনক জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে ; গো মেষাদি পশুগণ মাঠ হইতে পালে পালে নগরে প্রবেশ করিতেছে, চারিদিকেই অব্যক্ত আর্ত্তনাদমাত্র শ্রবণগোচর হইতেছে। সকলেই আকুলিতচিত্তে কেবল সম্মুখের দিকে চলিতেছে, কিন্তু কোথা যাইতেছে কিছুই বুঝিতেছে না। প্রধান প্রধান পুরবাসীরা আপনা-দিগকে সামান্য ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে মেণ্টর প্রতারক, কেবল কয়েক দিবস বাঁচিবার নিমিত্ত স্বকপোলকল্পিত এক মিথ্যা ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়াছে।

তৃতীয় দিবস পরিপূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারা স্বীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেছেন,এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি

নিবিড়ঘনঘটাসদৃশ রজোরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। অনতিবিলম্বেই অসংখ্য অস্ত্রধারী অসভ্যদল সুব্যক্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। যাহারা মেণ্টরের ভবিষ্যসূচনাতে অশ্রদ্ধা করিয়া স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষণে যত্নবান হয় নাই, তাহারা এক্ষণে সর্ব্বস্ববিনাশরূপ সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে রাজা মেণ্টরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা যে গ্রীক্-জাতি তাহা আমি এই অবধি বিস্মৃত হইলাম, তোমরা আর আমার শত্রু নহ, পরম মিত্র! দেবতারা নিঃসন্দেহ আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্তই তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি যথাসময়ে যেরূপ প্রজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ, তোমাকে যথাসময়ে তদনুরূপ শৌর্য্যও প্রকাশ করিতে হইবে; অতএব আর কেন বিলম্ব করিতেছ। পূর্ব্বাহ্ণে ভবিষ্যসূচনা করিয়া যেমন নিস্তার করিয়াছ, এক্ষণে সমরসজ্জা করিয়া সেইরূপ নিস্তার কর। তোমা ব্যতিরেকে যেমন অগ্রে এই বিপৎপাতের বিষয় অবগত হইবার উপায় ছিল না, তেমনই এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবারও পথ নাই।

এই বাক্য শ্রবণ মাত্র মেণ্টরের নেত্র হইতে এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে ভীষণদিগেরও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল এবং গর্ব্বিতদিগেরও গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া অন্তঃকরণে ভক্তিভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি বাম করে চর্ম্ম, শিরে শিরস্ত্রাণ ও কটিদেশে তরবারি ধারণ করিলেন, দক্ষিণ করে ভল্ল লইয়া সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং এসেষ্টিসের সৈন্যসকল সমভিব্যাহারে করিয়া

বিপক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এসেষ্টিসের বিলক্ষণ সাহস ছিল; কিন্তু জরাজীর্ণ কলেবরপ্রযুক্ত তিনি মেণ্টরের নিকটে থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থিতি করিলেন। এসেষ্টিস অপেক্ষা আমি মেণ্টরের সমীপবর্ত্তী ছিলাম; কিন্তু ক্রিয়া দ্বারা তদীয় অপ্রতিম শৌর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইতে পারি নাই। রণস্থলে তাঁহার উরস্ত্রাণ মিনর্ব্বা দেবীর করস্থিত অক্ষয় চর্ম্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল যেন মৃত্যু তাঁহার করাল করবালের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। যেমন প্রচণ্ড সিংহ ক্ষুধাকালে সমধিক ভীষণ হইয়া মেষগণের উপর আক্রমণ করে এবং অবাধে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, আর মেষপালকেরা স্ব স্ব মেষগণের পরিত্রাণের চেষ্টা না পাইয়া ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া স্ব স্ব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে থাকে, সেইরূপ মেণ্টর রণক্ষেত্রে অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিপক্ষগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন।

অসভ্যজাতিরা মনে করিয়াছিল, অতর্কিতরূপে নগর আক্রমণ করিবেক, কিন্তু তাহা না হইয়া, তাহারাই অতর্কিতরূপে আক্রান্ত ও পরাভূত হইল। এসেষ্টিসের প্রজাগণ মেণ্টরের দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া যৎপরোনাস্তি পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের যে তাদৃশ পরাক্রম ছিল, ইহা তাহারা পূর্ব্বে অবগত ছিল না। বিপক্ষরাজকুমার সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া নগর আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, আমার হস্তে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। আমরা দুইজনে সমবয়স্ক ছিলাম, কিন্তু তিনি আমা অপেক্ষা সমধিক

দীর্ঘাকার ছিলেন। আমি দেখিলাম, তিনি আমাকে হীনবীর্য্য স্থির করিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভয়ানক আকার প্রকার ও বীর্য্যাধিক্য গণনা না করিয়া আমি তাঁহার বক্ষঃস্থলে ভল্ল প্রহার করিলাম। সেই ভল্ল হৃদয়ের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি শোণিত প্রবাহ উদ্গার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যৎকালে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন, তাঁহার গুরুতর দেহভারে নিপীড়িত হইয়া আমার প্রাণবিনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় প্রাণরক্ষা হইল। পতন সময়ে তাঁহার অস্ত্রাদির শব্দে দূরস্থিত পর্ব্বতসমূহে প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিল। তদনন্তর আমি তাঁহার শরীর হইতে অস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় সামগ্রী উন্মোচন করিয়া লইয়া এসিষ্টিসের অনুসন্ধানে চলিলাম। বিজয়ী মেণ্টর যাহাদিগকে প্রতিবন্ধকতার লেশ মাত্র প্রদর্শন করিতে দেখিলেন তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং যাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইয়াছিল তাহাদিগকে জঙ্গল পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিলেন।

এই সংগ্রামে কাহারও এমন আশা ছিল না যে, অসভ্যেরা পরাভূত হইবেক, কিন্তু অসাধারণ বীর্য্য ও অলৌকিক পরাক্রম প্রভাবে মেণ্টরকে জয়ী হইতে দেখিয়া আপামর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাকে দেবানুগৃহীত অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল। এসিষ্টিস কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ আমাদিগকে কহিলেন, আমি অবিলম্বে তোমাদের প্রস্থানের সমুদায় আয়োজন করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি আমাদিগের নিমিত্ত এক নৌকা

সজ্জিত করাইয়া ভূরি ভূরি উপহার প্রদানপূর্ব্বক অবিলম্বে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন। তৎকালে সিসিলির লোক গ্রীসদেশে যাইলে তথায় তাহাদের বিপদ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, এজন্য তিনি আপন প্রজাগণের মধ্য হইতে একটিও লোক না লইয়া ফিনীশিয়াদেশীয় কতিপয় সাংযাত্রিক বণিকদিগকে আমাদের সঙ্গে দিলেন; তাহারা বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বত্র গমনাগমন করে, সুতরাং কোনও স্থানেই তাহাদের তাদৃশ বিপদের আশঙ্কা ছিল না। আমাদিগকে ইথাকা নগরীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া রাজসমীপে প্রত্যবর্ত্তন করিবেক, এই নিয়মে তাহারা আমাদিগের সহিত যাত্রা করিল; কিন্তু দেবতারা মানবগণের কল্পনা সকল ব্যর্থ করিয়া দেন। দৈববিড়ম্বনায় আমরা সঙ্কল্পিত স্বদেশ প্রতিগমনে বিফলপ্রযত্ন ও নানা বিপদে পতিত হইলাম।

মিশর দেশের অধীশ্বর সিসষ্ট্রিস স্বীয় বাহুবলে অশেষ দেশ জয় করিয়া ভূমণ্ডলের নানা খণ্ডে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফিনীশিয়ার অন্তর্গত টায়র নগর সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী, সুতরাং বিপক্ষ সহসা তদ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ বহুবিস্তৃত বাণিজ্যদ্বারা তাহারা অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল; সহসা কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবেক না এই সাহসে ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না এবং সিসষ্ট্রিসকেও অগ্রাহ্য করিত। এইহেতু তিনি বহুকালাবধি তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়াছিলেন, অবশেষে সময় বুঝিয়া স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে ফিনীশিয়া প্রবেশ

করিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ দমন করিলেন এবং তাহাদিগকে নিরূপিতকরদানে সম্মত করিয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন করিলে তাহারা পুনরায় নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইল। তদীয় প্রত্যাগমনোপলক্ষে রাজধানীতে যে মহোৎসব হইতেছিল, ঐ মহোৎসবসময়ে তাঁহার ভ্রাতা তদীয় প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার চেষ্টায় ছিলেন। টায়রায়েরা কেবল করদানে অসম্মত হইয়া ক্ষান্ত ছিল এমন নহে, এই ব্যাপারে তাঁহার ভ্রাতার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছিল। সিসষ্ট্রিস্ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মাইব, তাহা হইলেই তাহারা খর্ব্ব হইয়া আসিবেক। অনন্তর বহুসংখ্যক সংগ্রামপোত রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া এই আদেশ দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, ফিনীশিয়াদেশীয় পোত দেখিলেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে অথবা জলে মগ্ন করিয়া দিবে।

সিসিলি দ্বীপ দৃষ্টিপথের অতীত হইবা মাত্র আমরা দেখিতে পাইলাম সিসষ্ট্রিসের প্রেরিত পোত সকল প্লবমান নগরীর ন্যায় আমাদিগের নিকটে আসিতেছে। আমরা ফিনীশিয়াদেশীয় পোতে অধিরূঢ় ছিলাম। আমাদিগের নাবিকেরা সিসষ্ট্রিসের আদেশের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিল। এক্ষণে তদীয় পোতসমূহ সন্নিহিত হইতে দেখিয়া ভয়ে একান্ত অবিভূত হইল এবং উপস্থিত ঘোর বিপদের আর প্রতীকারের সময় নাই ভাবিয়া একেবারে হতবুদ্ধি

হইয়া গেল। বিপক্ষেরা অনুকূল বায়ু পাইয়াছিল এবং আমাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের ক্ষেপণী অধিক ছিল, সুতরাং তাহারা অবিলম্বেই আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নির্ব্বিবাদে আমাদের পোতের উপর উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করিল এবং বন্ধন করিয়া মিসর দেশে লইয়া চলিল। আমি তাহাদিগকে বারংবার বলিলাম যে, আমি ও মেণ্টর ফিনীশীয় নহি, কিন্তু তাহারা আমার এই বাক্যে বিশ্বাস বা মনোযোগ করিল না। তাহারা জানিত যে, ফিনীশীয়েরা দাসব্যবসায় করে, সুতরাং মনে করিল তাহারা আমাদিগকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন রাজভৃত্যেরা কি প্রকারে আমাদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবেক কেবল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলাম, নীলনদের ধবলপ্রবাহ অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে। মিসর দেশের উপকূল দূর হইতে জলদমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর আমরা ফারস দ্বীপে উপনীত হইলাম এবং তথা হইতে নীলনদ দ্বারা মেম্ফিস পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বন্দীভাবনিবন্ধন শোকাভিভবে যদি আমরা সুখাস্বাদনে একবারেই অক্ষম হইয়া না যাইতাম, তাহা হইলে, মিশর দেশের শোভা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইতাম সন্দেহ নাই। ঐ দেশ অসংখ্য জলনালী প্রবাহিত অতি প্রকাণ্ড উদ্যানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধনিজনপরিপূরিত নগর, মনোহর হর্ম্ম্য, সুবর্ণোপমশস্যোৎপাদক ক্ষেত্র ও পশুগণপরিপূরিত পরীণাহদ্বারা

নীলনদের উভয় পার্শ্ব কি অনুপমশোভাসম্পন্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ দেশে বসুমতী এত অপরিমিত শস্য প্রসব করেন যে, কৃষাণগণ আশার অধিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত এমন প্রফুল্ল মনে কাল যাপন করে যে, সকল গৃহে সর্ব্বসময়ে মহোৎসব বোধ হয়। ফলতঃ, তদ্দেশবাসীদিগকে সাংসারিক কোনও বিষয়ের অসঙ্গতিনিবন্ধন কখনও কোনও ক্লেশ পাইতে হয় না। রাখাল দিগের আনন্দসূচক গ্রাম্যগাননিনাদে চতুর্দ্দিক অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া মেণ্টর চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই রাজ্যের প্রজাগণ কি সুখী! তাহারা নিয়ত ধন ধান্য প্রভৃতি সাংসারিক সুখোপকরণে সম্পন্ন হইয়া কেমন স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে। এই সমস্ত সুখের নিদানভূত যে নরপতি, তিনি নিঃসন্দেহ তাহাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণয়ভাজন হইয়া হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। অতএব, টেলিমেকস! যদি দেবতারা তোমাকে তোমার পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন, রাজধর্ম্মানুসারী হইয়া তোমার এই-রূপে প্রজাগণের সুখ-সমৃদ্ধি-সংবর্দ্ধনে তৎপর হওয়া উচিত। তুমি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতি-পালন করিবে, তাহা হইলেই তোমার যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইবেক। তখন তোমার প্রতি তাহাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণয় দেখিয়া তুমি পিতার পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেক। এই সিদ্ধান্ত যেন নিরন্তর তোমার অন্তরে জাগরূক থাকে যে, রাজা ও প্রজা উভয়ের সুখ অভিন্ন! প্রজাদিগকে সুখে রাখিলেই রাজার সুখ।

তাহারা সুখসমৃদ্ধিসময়ে তোমাকে পরম উপকারক বলিয়া স্মরণ করিবেক এবং অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দুর্ভেদ্য উপকৃতি-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেক। যে রাজারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল প্রজাগণের ভয়াবহ হইতেই যত্নবান হয় এবং অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়, তাহারা মানবজাতির পক্ষে দৈবনিগ্রহস্বরূপ। প্রজাগণ তাদৃশ প্রজাপীড়ক দুরাত্মাদিগকে ভয় করে যথার্থ বটে ; কিন্তু যেমন ভয় করে তদ্রূপ ঘৃণা ও দ্বেষও করিয়া থাকে।

আমি উত্তর করিলাম, হায় ! এক্ষণে রাজনীতি পর্য্যালোচনার প্রয়োজন কি। আমাদিগের ইথাকা নগরী প্রতিগমনের আর আশা নাই। জন্মাবচ্ছিন্নে আর জননী ও জন্মভূমি দেখিতে পাইব না। আর ইহাও একেবারেই অসম্ভাবিত নয় যে, পিতা পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন ; কিন্তু যদিই দৈবানুগ্রহবলে প্রত্যাগমন করেন, আর তিনি কখনই নন্দনালিঙ্গনরূপ অনুপম আনন্দরসের আস্বাদনে অধিকারী হইবেন না এবং আমিও রাজ্যশাসনযোগ্য কাল পর্য্যন্ত পিতার আদেশানুবর্ত্তী থাকিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিব না। দেবতারা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পাশূন্য হইয়াছেন। অতএব হে প্রিয় বান্ধব! মৃত্যুই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এক্ষণে মৃত্যুচিন্তা ব্যতিরিক্ত আর সকল চিন্তাই বৃথা। আমি শোকে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম এবং কথনকালে মুহুর্মুহুঃ এমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম যে, আমার বাক্য প্রায় বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু

মেণ্টর উপস্থিত বিপদে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইয়াছেন এরূপ বোধ হইল না। তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি মহাবীর ইউলিসিসের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহ। তুমি কি প্রতিকারচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া বিপদে অভিভূত হইবে? তুমি নিশ্চিত জানিবে, যে দিনে জননী ও জন্মভূমি পুনর্ব্বার তোমার নয়নগোচর হইবে, সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে যে, যিনি অসাধারণ শৌর্য্য দ্বারা জগন্মণ্ডলে দুর্জ্জয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; যিনি, কি দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, সকল সময়েই অবিকৃতচিত্ত; তুমি এক্ষণে যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছ তদপেক্ষা ভীষণতর বিপদেও যিনি অক্ষুব্ধচিত্ত থাকেন ও তাদৃশ সময়েও যাঁহার ঈদৃশী প্রশান্তচিত্ততা থাকে যে তদ্দর্শনে তুমি বিপৎকালে সাহসাবলম্বনের উপদেশ পাইতে পার এবং যাঁহাকে এই সমস্ত অলৌকিক-গুণ-সম্পন্ন বলিয়া তুমি কখন জানিতে পার নাই, সেই মহানুভব মহাবীর ইউলিসিস যশঃশশধরে জগন্মণ্ডল দেদীপ্যমান করিয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। এক্ষণে তিনি প্রতিকূল বায়ু বশে যে দূর-দেশে নীত হইয়া আছেন, যদি তথায় তিনি শুনিতে পান তাঁহার পুত্র পৈতৃক ধৈর্য্য ও পৈতৃক বীর্য্যের উত্তরাধিকারী হইতে যত্নবান্ নহেন, তাহা হইলে, তিনি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ঘোরতরদুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তদপেক্ষা এই সংবাদ তাঁহার পক্ষে নিঃসন্দেহ সমধিক ক্লেশাবহ হইবেক।

তদনন্তর মেণ্টর কহিলেন, টেলিমেকস! দেখ মিসর দেশের কি

অনুপম শোভা! দর্শন মাত্র বোধ হয়, কমলা সর্ব্বকাল নগরে বিরাজমানা আছেন। এই দেশে দ্বাবিংশ সহস্র নগর; ঐ সকল নগরে কি সুন্দর শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে; ধনবান দরিদ্রের উপর ও বলবান্ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে না। বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম! তাহারা বশ্যতা, পরিশ্রম, সদাচার ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। মাতা পিতারা ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপট ব্যবহার ও দেবভক্তি এই সমস্ত গুণের বীজ শৈশবকালাবধি স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের অন্তঃকরণে রোপণ করিতে আরম্ভ করেন। এই মঙ্গলকর নিয়মাবলী অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজা এইরূপ সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, তাঁহার প্রজারাই যথার্থ সুখী; কিন্তু যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজার দয়াদাক্ষিণ্যগুণে অসংখ্য লোকের সুখ সংবর্দ্ধিত হয় এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতা নিবন্ধন যাঁহার হৃদয়কন্দর নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত থাকে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুখী। তাঁহাকে দুরাচার নরপতিদিগের ন্যায় ভয় দেখাইয়া প্রজাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয় না, প্রজারা নিজেই তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বশীভূত থাকে এবং তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করে। তিনি প্রজাগণের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য করেন। প্রজারা তাঁহাকে এরূপ স্নেহ ও ভক্তি করে যে, তাহাদিগের তদীয় রাজ্যভঙ্গের অভিলাষ

করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার মর্ত্ত্যতা চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হয় এবং যদি আপন আপন জীবন দিলে রাজা চিরজীবী হইতে পারেন তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

আমি তদ্গতচিত্তে মেণ্টরের এই বচনপ্রবন্ধ শ্রবণ করিতে লাগিলাম; শ্রবণ করিতে করিতে আমার অন্তঃকরণ সাহস ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবিখ্যাত মেম্পিস নগরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, তথাকার শাসনকর্ত্তা আমাদিগকে থীব্‌স নগরে এই অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিলেন যে,রাজা সিসষ্ট্রিস টায়রীয়দিগের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত ছিলেন, অতএব স্বয়ং প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আমরা যথার্থ টায়র-নিবাসী কি না। তদনন্তর আমরা নীলনদ দ্বারা শতদ্বারশোভিত সুপ্রসিদ্ধ থীব্‌স নগর যাত্রা করিলাম। তথায় ঐ পরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। আমরা দেখিলাম, থীব্‌স নগর অতি বিস্তৃত ও অতি সমৃদ্ধ, গ্রীসদেশীয় নগর সমূহ অপেক্ষা সমধিকশোভা-সম্পন্ন। রাজপথ সকল সুবিস্তৃত; মধ্যে মধ্যে নিপান ও জলনালী সকল নির্ম্মিত আছে। এই নিয়ম দ্বারা প্রজাগণের যে উপকার ও কৃষিকার্য্যের যেরূপ সুবিধা তাহা বর্ণনাতীত। স্থানে স্থানে মনোহর হর্ম্ম্য, প্রস্রবণ, কীর্ত্তিস্তম্ভ ও শিলাময় মন্দির সকল শোভমান রহিয়াছে। রাজভবন একটি নগরীর ন্যায় বিস্তৃত এবং স্বর্ণ, রজত ও শিলাময় নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত।

রাজা সিসষ্ট্রিস প্রতিদিন নিরূপিত সময়ে স্বয়ং প্রজাদিগের অভিযোগ ও রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ শ্রবণ করিতেন,

দর্শনার্থী বা বিচারপ্রার্থী কাহাকেও অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করিতেন না। তিনি প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং মনে করিতেন, কেবল তাহাদিগের হিতের নিমিত্তই জগদীশ্বর তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বিদেশীয় লোক-দিগের প্রতি সাতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন এবং তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেন; কারণ তিনি মনে করিতেন, ভিন্নদেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি অবগত হইলে, অবশ্যই কিছু জ্ঞানলাভ হইবেক। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে আমরা তৎসমীপে নীত হইয়া দেখিলাম, রাজা স্বর্ণময় রাজদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া গজদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে আসীন আছেন। তিনি পরিণতবয়স্ক বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাঁহার শরীরে লাবণ্য ও তেজস্বিতা এবং আকারে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সুব্যক্ত লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার বিচারশক্তি এমন অদ্ভুত যে, যথেচ্ছ প্রশংসা করিলেও চাটুবাদের অপবাদগ্রস্ত হইতে হয় না। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা দিবাভাগ এবং শাস্ত্রানুশীলন ও সাধুজনের সহিত সদালাপ দ্বারা সায়ংকাল অতিবাহিত করিতেন। পরাজিত নরপতিদিগের প্রতি অতিমাত্র গর্হিত ব্যবহার ও একজন রাজপুরুষের উপর অনুচিত বিশ্বাসন্যাস এই দুই ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও দোষ ছিল না। আমাকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া রাজার হৃদয়ে করুণাসঞ্চার হইল। তিনি আমাকে নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহার বাক্যের ঔচিত্য ও গাম্ভীর্য্য শ্রবণে চমৎকৃত

হইলাম। আমি উত্তর করিলাম, হে নরদেবসিংহ! আপনি অবগত আছেন, ট্রয় নগর দশ বৎসর অবরুদ্ধ থাকিয়া পরিশেষে ভস্মাবশেষ হয় এবং ঐ ব্যাপারে বহুসংখ্যক গ্রীসদেশীয় প্রধান বীরপুরুষ বিনষ্ট হন। ইথাকার রাজা ইউলিসিস আমার পিতা; তাঁহার বিজ্ঞতাখ্যাতি ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশে ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও বিজ্ঞতাবলে দশবার্ষিক অবরোধের পর ট্রয় নগর নিপাতিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, কার্য্যশেষ করিয়া তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনাভিলাষে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় অদ্যাপি নিজ রাজধানী দর্শন করিতে পারেন নাই, বোধ হয়, সাগরপথের পান্থ হইয়া আছেন। আমিও তাঁহার অন্বেষণার্থ নির্গত হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাজের অধিকারে বন্দী হইয়াছি। মহারাজ! যাহাতে আমি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া পিতাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিতে পারি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিন; প্রার্থনা করি, দেবতাদিগের প্রসাদে আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া অবচ্ছিন্ন সাংসারিক সুখসম্ভোগে কালযাপন করুন। আমার দুর্দ্দশা শ্রবণে রাজার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাহা আমি বলিলাম উহা যথার্থ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া আমাদিগকে একজন রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই আদেশ দিলেন যে, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ইহারা যথার্থ গ্রীক অথবা ফিনীশীয়; যদি ইহারা ফিনীশীয় হয়, তাহা হইলে যে কেবল শত্রু বলিয়া দণ্ডনীয় হইবেক এমন নহে মিথ্যাকথন ও প্রতারণা

জন্য যথাযোগ্য শাস্তিও প্রাপ্ত হইবেক। কিন্তু যদি ইহারা যথার্থ গ্রীক হয়, তাহা হইলে, আমি ইহাদিগের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন ও সদয় ব্যবহার করিব এবং আহ্লাদিতচিত্তে ইহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিব। গ্রীস দেশের প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ আছে, কারণ তথাকার অনেক নিয়ম ও রীতি নীতি মিসর দেশ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমি হিরাক্লিসের গুণগ্রাম ও একিলিসের মহাত্মতার বিষয় অনবগত নহি। ইউলিসিসের বিজ্ঞতার বিষয় শুনিয়া সাতিশয় প্রীত আছি। আমার স্বভাব এই, গুণবানের ও ধার্ম্মিকের দুঃখবিমোচনে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকি।

রাজা সিসষ্ট্রিস যেমন অমায়িক ও মহানুভাব, মিটফিস নামে তাঁহার একজন কর্ম্মকর্ত্তা তেমনই দুরাচার ও স্বার্থপর। ঐ ব্যক্তির প্রতি রাজা আমাদিগের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার ভার প্রদান করিলেন। মিটফিস কূট প্রশ্ন দ্বারা আমাদিগের চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং মেণ্টরের উত্তর শ্রবণে তাঁহাকে আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নির্গুণেরা অন্যের গুণ দর্শনে আপনাদিগকে যেরূপ অবমানিত বোধ করে আর কিছুতেই সেরূপ করে না। বস্তুতঃ, তিনি মেণ্টরকে আপন অপেক্ষা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রশ্নকালে নানা কৌশল করিলেন, কিন্তু মেণ্টরের চিত্তবিভ্রম জন্মাইতে পারিলেন না এবং মেণ্টরের নিকটে থাকাতে আমারও চিত্তভ্রম জন্মিল না; অতএব তিনি আমাদিগকে পৃথক পৃথক

স্থানে রাখিয়া দিলেন। তদবধি আমি মেণ্টরের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই বন্ধুবিয়োগ আমার পক্ষে বজ্রপাতবৎ আকস্মিক ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। মিট্রফিস আমাদিগকে এই অভিপ্রায়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে পরস্পরকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া প্রশ্ন করিলে অবশ্যই উভয়ের উত্তরে বিসংবাদিতা দৃষ্ট হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, মেণ্টর যাহা কিছু গোপন রাখিয়াছিলেন, আমাকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়া লইবেন। সত্যাব-ধারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কোনও একটা ছল করিয়া রাজার নিকটে আমাদিগের ফিনীশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; কারণ ফিনীশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তদীয় সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়া আমাদিগকে যাবজ্জীবন দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। আমাদিগের কোনও বিষয়েই কিঞ্চিন্মাত্র অপরাধ ছিল না এবং রাজাও সাতিশয় বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি ঐ দুরাত্মার অভীষ্টসিদ্ধি হইল। মিট্রফিস তাঁহার অসংখ্য গো মেষাদি পশুচারণ নিমিত্ত আমাকে অন্যান্য দাসগণের সহিত অরণ্যমধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে আমি এমন বিষম দুঃখে পড়িয়াছিলাম যে, আমার বুদ্ধিলোপ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায়, মৃত্যু ও দাসত্ব এই উভয়ের ইতরবিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না; নতুবা বোধ হয়, তৎকালে আমি প্রাণত্যাগ করিতাম, কখনও দাসত্ব-স্বীকারে সম্মত হইতাম না। যাহা হউক, দাসত্ব অনিবার্য্য হইয়া

আমার স্কন্ধে পড়িল এবং দুর্দ্দশার একশেষ উপস্থিত হইল। প্রীতিদায়িনী আশালতাও আমাকে ছায়াদানে পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিল। দেখিলাম, দাসত্বভঞ্জনের আর কোনও উপায়ই নাই। এই সময়েই কতিপয় ইথিওপিয়ানিবাসী লোক মেণ্টরকে ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া গেল। আমি গোচারণ নিমিত্ত অরণ্যে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল নিরন্তর তুহিনরাশিপরিবৃত, নিম্নস্থল উত্তপ্তবালুকাময়; সুতরাং উপরিভাগে অবিচ্ছিন্ন শীত, নিম্ন প্রদেশে অসহ্য গ্রীষ্ম; তৃণাদি অতি বিরল, কেবল গণ্ডশৈলের মধ্যে মধ্যে অত্যল্প মাত্র লক্ষিত হয়; পর্ব্বত সকল নতোন্নত ও দুরারোহ, পর্ব্বতমধ্যস্থলে রবিকিরণ প্রায় প্রবেশ করিতেই পারে না। এই ভীষণ স্থানে মূর্খ ও অসভ্য রাখালগণ ব্যতিরিক্ত আলাপ করিবার আর লোক ছিল না। তথায় আমি দিবাভাগে গোচারণ করিয়া, স্বীয় দুরবস্থা নিমিত্ত পরিবেদন করিতে করিতে রজনী অতিবাহন করিতাম। বিউটিস নামে এক জন প্রধান দাস ছিল, সে আপন দাসত্ব বিমোচনের কোনও প্রত্যাশা পাইয়া, স্বামিকার্য্যে অনুরাগ ও মনোযোগ প্রদর্শনার্থ অন্যান্য দাসগণকে অবিরত তিরস্কার করিত। পাছে তাহার কোপানলে পড়িতে হয় এই ভয়ে আমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সমস্ত দিবস কেবল পশুচারণই করিতাম। ফলতঃ, নানাপ্রকার দুঃখে আমি নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

৺ রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় (সংক্ষিপ্ত)।

মুসলমান-বিজয়।

হিন্দুকুশ-পর্ব্বত-প্রস্থে তিব্বত ও তুরাণের সন্নিকটে গৌড় নামে প্রদেশ আছে। সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের অধিবাসীরা অতিশয় কষ্টসহ। তাহাদের সাহায্যে গৌড়ীয় সামন্তেরা ক্রমে ক্রমে গজ্‌নির প্রভুতা হইতে স্বাধীন হইয়া উঠেন এবং অবশেষে তাহার ও খোরাসানের কোন কোন অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে বেহ্রাম নামে পুরুষ গজ্‌নির সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ইনি অসূয়া-পরবশ হইয়া চাতুর্য্যবলে তদানীন্তন গৌড়ীয় পতির প্রাণ সংহার করেন। সেই নৃশংস ব্যাপারের প্রতিশোধ চেষ্টায় কয়েকবার গজ্‌নী ও গৌড়ীয়দিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অবশেষে গৌড়ীয়দিগের ভাগ্য প্রবল হইয়া উঠে। গৌড়রাজ আলাউদ্দিন আসিয়া গজ্‌নি লুণ্ঠন এবং বহ্নি ও অসি দ্বারা উৎসন্ন করেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। তখন তাঁহার পুত্র গজ্‌নি রাজ্যের অধীশ্বর হন; কিন্তু অনধিকাল-মধ্যেই অপঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠভ্রাতুষ্পুত্র গয়েস্‌উদ্দিন গজ্‌নীয়া রাজ্যের অধিপতি হইয়া, স্বীয় ভ্রাতা মহম্মদ সবাবুদ্দিনকে অপনার সহকারী করিলেন। সবাবুদ্দিন, মহম্মদ গোরী নামেই অধিক খ্যাত। ইনি বারংবার ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং তথায় এত স্থান অধিকার করেন যে ইঁহাকেই ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রভুতার প্রকৃত স্থাপন-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

মহম্মদ গোরী গজ্‌নির রাজবংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃশঙ্ক হইয়া হিন্দু স্বাধীনতার বিনাশ সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার সেনারা পর্ব্বতবাসী, কষ্টসহ ও সমরচতুর; এ দিকে হিন্দু রাজারা পরস্পর অনৈক্যদূষিত। তাঁহাদের সৈন্যকুল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও বিশৃঙ্খল; সুতরাং মহম্মদ অল্পায়াসেই জয়লাভ করিবেন আপাততঃ এরূপ বোধ হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। প্রায় কোন হিন্দু রাজাই ঘোর সংগ্রাম বিনা স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করেন নাই। বিশেষতঃ রাজপুতেরা কখনই পরাভূত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশও সম্পন্ন হইয়াছে; রাজপুতেরা অদ্যাপি স্বাধীন রহিয়াছে।

মহম্মদ গোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্ব্বে দিল্লীর রাজার মৃত্যু হয়। আজমীঢ় ও কনোজ উভয়স্থানের রাজারাই তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন। তিনি আজমীঢ়পতিকেই দিল্লীরাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ইহাতে কনোজরাজ মহাক্ষুব্ধ হইয়া বারংবার আজমীঢ়াধিপতির সহিত সংগ্রাম করেন। এই সকল অন্তর্ব্বিবাদ মহম্মদের জয়লাভের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল।

মহম্মদ প্রধানতঃ দিল্লী ও আজমীঢ়ের তদানীন্তন অধিপতি পৃথুকে আক্রমণ করেন। থানেশ্বর ও কর্ণালের অন্তর্ব্বর্ত্তী তিরৌরীর ক্ষেত্রে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মহম্মদ সমরে তুরস্ক প্রণালী অবলম্বন করেন। সেই প্রণালীতে পার্ষ্ণি হইতে ক্রমাগত নূতন নূতন অশ্বদল শত্রুর সম্মুখীন হইয়া আক্রমণ করে এবং ক্লান্ত হইলেই পার্ষ্ণিদেশে চলিয়া যায়। হিন্দুদিগের প্রণালীতে

সেনারা একত্র থাকে এবং শক্রসৈন্যের পার্শ্বদেশ ঘূরিয়া একেবারে পরিবেষ্টন করিবার চেষ্টা পায়। এই যুদ্ধে হিন্দুপ্রণালী অধিক ফলোপধায়িনী হইয়াছিল। সবাবুদ্দিন হিন্দুব্যূহের মধ্যভাগে নিয়ত আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রতিপক্ষেরা ঘূরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। সেই প্রক্রিয়ার ও হিন্দুদিগের হস্তিযূথের ভীমনাদে মুসলমানেরা একান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রধান প্রধান আমীরেরা অনেকে সদলে পলায়ন করিলেন। মহম্মদ অসীম সাহসে শক্রসৈন্যের দুষ্প্রবেশ ভাগ আক্রমণ করিয়া রাজার ভ্রাতাকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন, অবশেষে স্বয়ং আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলে অনুচরবর্গ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল। হিন্দুরা বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়াইয়া গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

গজ্‌নিতে যাইয়া কিছুকাল আমোদ প্রমোদের পর, মহম্মদ আবার ভারতবর্ষ আক্রমণের আয়োজনে তৎপর হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ববারের পরাভবের অপমান নিয়ত জাগরূক ছিল। তখন যে সকল আমীর পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ নিগ্রহ দ্বারা ভবিষ্যতে তাদৃশ আচরণের বিলক্ষণ প্রতিবিধানের পর মহম্মদ বহুসংখ্যক সমরকুশল সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা পৃথুও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৈন্যের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। উভয় দল সম্মুখীন হইলেন। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে পূর্ব্ব বারের পরাভব স্মরণ করাইয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন, পলায়ন ভিন্ন

তোমাদের উপায়ান্তর নাই; মহম্মদ সদ্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া তাহা করিলে আমরা তাঁহার উপর কোনরূপ উপদ্রব করিব না। এই অহমিকায় চতুর মুসলমান ভয়ের ভাণ করিয়া উত্তর পাঠাইলেন, আমার ভ্রাতা রাজা, আমি তাঁহার অধীন সেনানী মাত্র। ভ্রাতার অনুমতি বিনা আমার আপন ইচ্ছায় প্রতিগমনের সাধ্য নাই। অতএব যাবৎ সেই অনুমতি না আইসে, অনুগ্রহ করিয়া তাবৎ কাল সন্ধি স্থাপন করিলে পরম আহ্লাদিত হই। হিন্দুরা তচ্ছ্রবণে সর্ব্বথা সতর্কতাপরিশূন্য হইয়া রজনীতে উৎসব করিতে লাগিলেন। মুসলমান সেনানী নিয়ত লক্ষ্য করিয়া যেমন দেখিলেন, হিন্দুরা অতিশয় বীতশৃঙ্খল হইয়াছে, অমনি অন্ধকারের সুযোগে তাহা-দিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু হিন্দুশিবির এরূপ বিস্তৃত ছিল যে, কিয়দংশ সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে না হইতেই অবশিষ্ট ভাগ ব্যূহীভূত হইয়া সম্মুখীন হইল। তখন মুসলমান সেনানায়ক জম্বুকচাতুর্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি পর্য্যায়ক্রমে একবার ধাবিত আরবার পলায়িত হইতে লাগিলেন। অবশেষে সায়ংকালে হিন্দু দলকে নিতান্ত ক্লান্ত দেখিয়া আপাদমস্তক বর্ম্ম-পরিহিত দ্বাদশ সহস্র অতি তেজস্বী অশ্বারোহী ধাবিত করিলেন। এপর্য্যন্ত ইহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই তাহাদের প্রথম উদ্যম। তাহারা এমন বেগে আক্রমণ করিল যে, আয়োধনশ্রান্ত হিন্দুরা আর নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সেনা শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

এই সময়ে অনেক হিন্দু সামন্ত পাতিত হইলেন। পৃথুরাজা

কিছুকাল বন্দীদশায় থাকিয়া অবশেষে মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর হস্তে অপঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। আজমীঢ় মুসলমানদিগের অধিকৃত হইল। উহার কিয়দংশ অধিবাসীর মস্তকচ্ছেদ, অবশিষ্ট দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইল। তদনন্তর মহম্মদ, কুতুবুদ্দিন নামা সেনানীর উপরে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া গজনীতে প্রস্থান করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কুতুব দিল্লী নগর অধিকার করিয়া মুসলমান-রাজত্ব বদ্ধমূল করিলেন।

(৺তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

অনুকরণ।

নব্য বাঙ্গালীর অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ইংরেজ কি বাঙ্গালী সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালী জাতিকে অহরহ তিরস্কার করিতেছে। কিন্তু অনুকরণ সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণ মাত্র কি দুষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য-সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনা অনুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল,

প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণ-ফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালী ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্পপরিমাণে যুনানীয়ের—বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাত ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, যে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই। কেন না, ইহজন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিয়াছে, ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষপ্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

সাহিত্য-সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক, আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়ক সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণে অমিতবলধারী বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ মহাভারতের অর্জ্জুনে পরিণত হইয়াছে এবং ভরত শত্রুঘ্ন, নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম নূতন সৃষ্টি, তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্য্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদুর; অভিমন্যু ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী, যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নীসহিত বনবাসী, উভয়েই রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্নী অপহৃতা আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা। উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জ্বলন্ত, একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পালা মণিপুরে বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্যবিন্ধনে পরিণত হইয়াছে, দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন, কিন্তু অনুকরণীয় এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তু মহাভারত

অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই; একে মন্দ তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণমাত্র ঘৃণ্য নহে। এবং বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ, ইহাতে যে বাঙ্গালীর স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতঃ উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালী দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালী হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালী কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালী মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐরূপ করিত। বাঙ্গালীর স্বভাবের দোষে এ অনুকরণ-প্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালীর তিনটি প্রধান জাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ,

আর্য্যবংশসম্ভূত; আর্য্যশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে; বাঙ্গালী কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে।

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালী যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য এবং তাঁহাদিগকে প্রায় গুণ-ভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটী মহা দুঃখ। বাঙ্গালী গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বঙ্গালীর অনুকরণ প্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি।

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্র্যের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য-ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব্বপদার্থ যদি এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি একপ্রকার হইত—মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণজ্বালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। ম্যাক্‌বেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক ম্যাক্‌বেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর

কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্ন পৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অনুকরণমাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না, সুতরাং কার্য্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য।

মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সকলেরই সামকালিক যথোচিত স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগুলি অধিকতর পরিপুষ্টি এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক এবং একজন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎসাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্যের আবশ্যকতা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্রবৈচিত্র্য কার্য্যবৈচিত্র্য এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণ প্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি এবং তাহার কার্য্য অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তিগণ একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র্য-হানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ঘটে না; সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তিসকলের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল প্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্ব-সকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুইপ্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃসভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষালাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতা লাভ বহুকাল-সাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালীর চরিত্র দোষ-জনিত নহে।

৪। অনুকরণমাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে এই

অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমন নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সংক্ষিপ্ত)।

আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

অনুমান চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে আদিম আর্য্যজাতির বসতি ছিল। হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমীয়, ইতালীয়, ইংরেজ, জর্ম্মাণ, ওলাণ্ডাজ, দিনেমার, স্পানীয়, রুশীয় প্রভৃতি অনেক জাতি প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন।

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত আচার ব্যবহার অনেক দূর নিরূপণ করিয়াছেন। মৃগয়া, পশুপালন ও ভূমিকর্ষণ এই তিন ব্যবসায় দ্বারা আর্য্যগণ জীবন যাপন করিত। মৃগয়াজীব ও পালিত জীবগণ গৃহপ্রিয় ছিল না এবং সর্ব্বদা এক স্থানে বাস করিত না; ফলতঃ আধুনিক তাতার ও আরব জাতীয়গণ যেরূপ বহু পরিবার ও গৃহপালিত জীব-জন্তু সমন্বিত হইয়া শিবির হইতে শিবিরান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ ভ্রমণপটু ছিল। কৃষকগণ

অপেক্ষাকৃত গৃহপ্রিয় ছিল এবং স্বভাবতঃই নিজ নিজ ভূমিতে আসক্ত থাকিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকগণ এরূপে এক স্থানে বাস করিত না; পশু-পালকগণ পশুর আবশ্যকীয় তৃণক্ষেত্র পাইবার জন্য, মৃগয়া-ব্যবসায়ী নূতন নূতন বন্য পশুর অন্বেষণে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত। আর্য্যগণ স্বদেশে এরূপ ভ্রমণপটু না হইলে গঙ্গা হইতে টেম্‌স্‌নদী পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিত না।

এইরূপ স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃই হউক, গৃহবিচ্ছেদ কারণেই হউক, খাদ্যের অভাবের জন্যই হউক বা পূর্ব্বদিকে তুরেণীয় জাতিদিগের আক্রমণ কারণেই হউক, আর্য্যগণ সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া নূতন বাসস্থান অন্বেষণ করিত এবং বর্ব্বর জাতিদিগকে জয় করিয়া নূতন নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিত। এইরূপে গৃহনিষ্ক্রান্ত একদল আর্য্যসন্তান আধুনিক ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করে; হিন্দুগণ এই আর্য্যের সন্ততি।

পরাজিত আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে অতি অসভ্য জাতি বাস করিত। ফলতঃ এক্ষণে যে ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ পর্ব্বতে ও জঙ্গলে বাস করে, তাহারাই ভারতবর্ষের অধিবাসী; তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে সমস্ত ভারতবর্ষে অধিবাস করিত। আর্য্যদিগের সহিত বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও দেশচ্যুত হইয়া তাহারা উর্ব্বর প্রদেশে সমস্ত ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও অরণ্যে আশ্রয়

লইয়াছে। নবাগত আর্য্যগণের সিন্ধু পার হইবার অচিরকাল পরেই এই আদিম অসভ্য জাতিদিগের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ছিল, আদিমবাসিগণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সর্ব্বদাই ঘৃণা করিত; এবং এই কৃষ্ণকায় শত্রুর ধ্বংসের জন্য দেবতার নিকট সর্ব্বদাই আরাধনা করিত। বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধের পর আদিমবাসিগণ ক্রমে পরাজিত হইল, সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ আর্য্যদিগের হস্তগত হইল। বিজিত অসভ্য জাতিগণ অনেকেই আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, অবশিষ্ট অংশ অরণ্য বা পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল।

আদিম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, আর্য্যগণ সুসভ্যও ছিল না, একেবারে বর্ব্বরও ছিল না। বর্ব্বর জাতিগণ বহু সংখ্যক মন্দপ্রকৃতি ভূত ও পিশাচে বিশ্বাস করে, সুসভ্য জাতিগণ সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। প্রাচীন আর্য্যজাতি এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী। আর্য্যগণ বহু ঈশ্বরবাদী ছিল; প্রকৃতির মধ্যে যাহা সুন্দর বা মহৎ বলিয়া বোধ হইত তাহারই পূজা করিত। অনন্ত নীল নভোমণ্ডলকে দ্যৌঃ বলিয়া পূজা করিত, কখনও বরুণ বলিয়া সম্বোধন করিত। সূর্য্য ও অগ্নি আর্য্যদিগের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। এই জাতির মধ্যে কোনরূপ মন্দির বা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণপ্রথা প্রচলিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না; বরং স্পষ্টতঃই প্রতীতি হয় যে, পুরোহিত বা পৃথক উপাসক সম্প্রদায় ছিল না; আকাশ বা সূর্য্যকে লক্ষ্য

করিয়া প্রত্যেক পরিবারের শ্রেষ্ঠ ও বৃদ্ধ পুরুষ পূজামন্ত্র পাঠ করিত এবং ফল মূল বা দুগ্ধ দান করিয়া নিজ নিজ যাচ্ঞা প্রকাশ করিত।

ভারতবর্ষে আগমনের পর এই ধর্ম্ম ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্যকেই সমধিক পূজা করিত। ইন্দ্র আকাশের দেবতা; তিনি সোমরস পান করেন এবং মনুষ্যের উপকারের জন্য সর্ব্বদাই বৃত্র ও পণি প্রভৃতি অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। অগ্নি অন্যান্য দেবগণকে আহ্বান করিয়া যাগযজ্ঞ সম্পাদন করেন। সূর্য্য মনুষ্যের হিতার্থ আলোক বিতরণ করেন। ফলতঃ হিন্দুধর্ম্ম এক্ষণে যে আকার ধারণ করিয়াছে, সিন্ধু-তীরবাসী আর্য্যগণের নিকট সে আকারে পরিচিত ছিল না। স্থান, কাল ও সভ্যতা অনুসারে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়। কালের ও সভ্যতার গত্যনুসারে সিন্ধু-তীরবাসী আর্য্যদিগের সরল প্রকৃতিপূজা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও সুন্দর সুন্দর উপন্যাসে বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়াছে।

আদিম হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না, ধর্ম্ম-ঘটিত অসমতাও ছিল না। আরাধনা-পদ্ধতি সরল ছিল; উপাসক ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দান করিতেন, নিজের বা পরিবারের কুশল বা স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন, গোবৎস বৃদ্ধির জন্য আরাধনা করিতেন, অথবা কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে জয় লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজগৃহে পূজা নির্ব্বাহার্থ এক এক জন পুরোহিত নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারও পরিচয়

পাওয়া যায়। পূজকের গৃহই মন্দির, ইহা ভিন্ন অন্য মন্দির ছিল না। প্রথম হিন্দুদিগের এইরূপ সরল ধর্ম্ম, এইরূপ সরল পূজা ও সরল বিশ্বাস ছিল।

কালক্রমে অনেক ধর্ম্মবিষয়ক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সমাজের প্রথমাবস্থায় সকলেই যেরূপ কৃষিকার্য্য, মেষপালনকার্য্য ও যুদ্ধকার্য্য সম্পাদন করে, পরে সেরূপ থাকে না; প্রতি ব্যবসায় অবলম্বনকারী লোক এক একটী ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়। হিন্দুদিগের সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত এই ঘটনা ঘটিল। জগতের অন্যান্য স্থানে যেরূপ, ভারতবর্ষেও সেইরূপ পূজকগণ একটী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইল, ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিল, ক্রমে আর কেহ ব্রাহ্মণকে না ডাকিয়া নিজের পূজা নিজে সম্পাদন করিতে পারিত না। পরাক্রান্ত গর্ব্বিত যোদ্ধা ও রাজগণও সামান্য লোক হইতে পৃথক্ হইয়া একটী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইল এবং ক্ষত্রিয় নাম ধারণ করিল। সামান্য কৃষি বা বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ যোদ্ধা বা পূজকদিগের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইত না। তাহারা একটী অধীন শ্রেণীভুক্ত হইয়া বৈশ্য নাম ধারণ করিল। পরাজিত কৃষ্ণকায় অসভ্যগণের মধ্যে যাহারা হিন্দুদিগের দাসত্ব স্বীকার করিল, তাহারা শূদ্র নাম ধারণ করিয়া আর্য্য-সন্তানদিগের দাস হইয়া রহিল।

এই জাতিবিচ্ছেদ সহসা বা এক দিনে সম্পাদিত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া এই বৃহৎ ঘটনাটী সম্পাদিত হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রথমে রচিত ঋগ্বেদের সংহিতায় চারি জাতির

পরিচয় পাওয়া যায় না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ মাত্র স্থানে স্থানে দেখা যায়; কিন্তু অন্যান্য শেষ রচিত বেদে উপরি উক্ত চারি জাতির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু জাতিবিচ্ছেদ সম্পাদিত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্তও ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র-বিষয়ক প্রাধান্য সর্ব্বদা স্বীকার করিত না, ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়দিগের শাস্ত্র-বিষয়ক প্রাধান্য সর্ব্বদা স্বীকার করিত না। উপনিষদের অনেক স্থানে ক্ষত্রিয়গণ দর্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে, ব্রাহ্মণগণ বিনীতভাবে তাহাই শিখিতেছে, এরূপ লিখিত আছে। পক্ষান্তরে পরশুরামের উপাখ্যান হইতে উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে অনেকবার পরাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সমস্ত বিরোধ লোপ পাইল এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ নির্ণীত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অন্য ব্যবসায়ে উৎকর্ষ বা প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিল। এই জাতিবিচ্ছেদ স্বরূপ ভিত্তির উপর হিন্দুদিগের নব্য সমাজ সংস্থাপিত হইল।

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অর্থবেদের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। প্রত্যেক বেদে সংহিতা অর্থাৎ আরাধনার সরল মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আড়ম্বর পরিপূর্ণ পূজার রীতি পদ্ধতি এবং উপনিষদ্ অর্থাৎ চিন্তাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এই তিন অংশ আছে। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ঋগ্বেদের সংহিতা পরিবর্দ্ধিত বা রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য বেদের সংহিতা প্রণীত হয় এবং ক্রমে চারি বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ রচিত হয়।

যে সময়ে আর্য্যগণ প্রথমে সিন্ধুতীরে আসিয়া বাস করিল, যখন তাহাদিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না, ধর্ম্মঘটিত অসমতা ছিল না, যখন পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দিয়া নিজের বা পরিবারের কুশলের জন্য বা গোবৎসাদির বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্র বা অগ্নি বা সূর্য্যকে সরলচিত্তে আরাধনা করিত, তখন ঋগ্বেদের সরল ও কবিত্বপূর্ণ সংহিতা রচিত হয়। এই সময়ে আর্য্যদিগের জাতীয় জীবনে বিশেষ বল লক্ষিত হয়। বেদের সংহিতা সেই বলের ছায়া মাত্র। সেই বলে বহু উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া, মেষপালক সমাজ ক্রমে জাতি-বিচ্ছেদ-মূলক সভ্য হিন্দুসমাজ রূপ ধারণ করে।

পরে যখন জাতিবিচ্ছেদ হইল, যখন পূজক বা ব্রাহ্মণ জাতি প্রাধান্য লাভ করিল, যখন আড়ম্বরপূর্ণ পূজার বৃদ্ধি হইল ও ধর্ম্মান্ধতা বৃদ্ধি পাইল, তখন বেদের ব্রাহ্মণ অংশ রচিত হইল। ব্রাহ্মণ অংশে কবিত্ব নাই, সরলতা নাই, চিন্তা নাই, মানসিক ক্ষমতার পরিচয় নাই, কেবল আড়ম্বর। পূজক প্রাধান্যবৃদ্ধির সহিত জাতীয় জীবন ক্ষীণবল হইল ও চিন্তাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইল। আর্য্যজাতির নূতন ও স্বাস্থ্যকর উন্নতি পূজকপ্রাধান্য ও ধর্ম্মান্ধতা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পূজকপ্রাধান্য অধিক দিন রহিল না। বেদবর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য লাভ করিল, তাহার প্রমাণ আছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে যেরূপ পূজকপ্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তৎপর রচিত উপনিষদ্ অংশে সেইরূপ ক্ষত্রিয়-

প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উপনিষদের অনেক অংশে ক্ষত্রিয়গণ দর্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে, বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় জাতীয় চিন্তার পরিচয় দিতেছে, এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু কেবল শিক্ষা ও চিন্তায় ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছিল এরূপ নহে। যে জনক রাজা উপনিষদের একজন প্রধান শিক্ষা-গুরু তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিনষ্ট করেন, পরে দাক্ষিণাত্য ভেদ করিয়া সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বল ও প্রাধান্য বিস্তার করেন। রামচন্দ্রের আখ্যান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ আখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, জনক রাজাও উপনিষদ্ রচনার সময়ে অর্থাৎ বেদবর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রবলে ব্রাহ্মণবলকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করে।

এই সময়ে ক্ষত্রিয়-প্রধান্যের আরও প্রমাণ আছে। কুরু-ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়বলের পরিচয় দিতেছে। সকলেই জানেন যে, বেদব্যাসের জীবিত কালেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়; বেদব্যাসের গল্প প্রকৃতই হউক বা নাই হউক, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে কোন লোক থাকুন বা নাই থাকুন, এই জনশ্রুতি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, কালে বেদ রচিত ও সঙ্কলিত হয়, সেই কালেরই শেষভাগে ক্ষত্রিয়বলের অপরিসীম বিকাশ হইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, বেদবর্ণিত কালের শেষ অংশে ক্ষত্রিয়বল ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

ক্ষত্রিয়বলের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, অস্ত্রবল বিকাশ পাইয়াছিল, আর্য্যদিগের জাতীয়-জীবন উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং অনার্য্য দাক্ষিণাত্য ভেদ করিয়া আর্য্যগৌরব প্রসারিত হইয়াছিল, এইরূপে হিন্দু জাতীয়জীবন দ্বিতীয়বার উৎকর্ষ লাভ করে ; উপনিষদ্, রামায়ণ ও মহাভারত তাহার ছায়া মাত্র।

বহুকাল পরে একজন ক্ষত্রিয় পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন ও মনুষ্যের সমতা প্রচার করিলেন। বুদ্ধের সেই শিক্ষাবলে ভারতবর্ষ পুনরায় উন্নতি সোপানে উঠিতে লাগিল। এই বৌদ্ধকালে অশোক আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় একছত্র করিলেন, এই কালে ষড়্দর্শন ও চিন্তাশক্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিল, এইকালে হিন্দু নাবিকগণ বঙ্গসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জাবা দ্বীপের আবিষ্কার করিল এবং এই কালে শিল্পবিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ অট্টালিকা ও শিল্পকার্য্যে আচ্ছাদিত করিল। হিন্দুজাতির চিত্ত এই তৃতীয়বার আলোড়িত হইল।

পরে যখন খ্রীষ্টের পর পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভস্মরাশির উপর পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন চিন্তাক্ষমতা পুনরায় উৎকর্ষ লাভ করিল, সমগ্র ভারতবর্ষে চিন্তাস্রোতঃ বহিতে লাগিল। একটী ব্রাহ্মণপ্রবর্ত্তিত বিপ্লব, এই বিপ্লবে ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ধীশক্তি, কল্পনা ও মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তিন চারিশত বৎসরের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়েই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্র পরাকাষ্ঠা

প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চীনভ্রমণকারী ভারতবর্ষের অর্থ ও সভ্যতা দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানসাগর মন্থন করিয়া অসংখ্য পুস্তক লিখিয়াছেন, বেদান্তদর্শনের নূতন রূপ দান করিয়াছেন এবং দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। ইহার পরই ভাস্করাচার্য্য 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' প্রণয়ন দ্বারা আপন নাম চিরস্মরণীয় করেন। তাহার পর ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের করকবলিত হইল, হিন্দু-সূর্য্য অস্তমিত হইল; সেই অবধি হিন্দুদিগের মানসিক বেগের আর পরিচয় পাওয়া যায় না।

(৺ রমেশচন্দ্র দত্ত।)

ভ্রাতা-ভগিনী।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটী মন্দীর ছিল। অনতি উচ্চ একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তর রাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটী পর্ব্বত তরঙ্গিনী কুল্‌কুল্‌ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল হইতে অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্যজলে স্নাত হইয়া সোপানারোহণপূর্ব্বক ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্য্যন্তও মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ বহু পুরাতন

বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাভাগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্যময় সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণ-কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ ও আহবে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র প্রশান্ত পর্ব্বতমন্দির বিগ্রহের রবে কলুষিত করে নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় উদ্বেগপরিপূর্ণ, প্রশস্ত ললাট, কুঞ্চিত মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না। রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়! এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম

করে। উন্মত্ততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণপাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিশীথে শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র বিভূষিত নৈশ-গগনমণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। সেই পুণ্যকথা শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল। শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানব-হৃদয় শান্তিরসে বিগলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে! সুন্দর বঙ্গদেশে, তুষার পূর্ণ পর্ব্বতবেষ্টিত কাশ্মীরে, বীরপ্রসূ রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে, সাগর প্রক্ষালিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে কত সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। যেন চিরকালই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখনই বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল; হস্তিনা, অযোধ্যা, মিথিলা, কাশী, মগধ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দ্দিনে এই গীত গাহিয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ ধর্ম্মরক্ষার্থ হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব

প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। অস্থ ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল এই পূর্ব্ব গীত মাত্র, যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্বকথা বিস্মৃত না হই, যতদিন জাতীয় জীবন থাকে, যেন হৃদয়-যন্ত্র এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।

নব্য, পাঠক! তুমি ইলিয়দ্ ও ইনিয়দ্ পাঠ করিয়াছ, দান্তে ও সেক্সপীয়র, গেতে ও হিউগো পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতর আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্বকথা! দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পতিব্রতা-কথা! হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখনও বিস্মৃত না হয়।

পাঠক! একত্র বসিয়া এক এক বার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

শান্তকাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের উত্তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তিসেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎকথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল!

আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল। ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শায়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন? দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকাপূর্ণ সংসারের সেই মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

'রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন? দুর্গ জয় করিতেছেন? যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শ্রান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহুদিনের কথা পূর্ব্বজীবনেরস্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে! শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা ও সুখ আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীনজনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর সূর্য্যমহলে ক্রীড়া করিতেন, হাস্যধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত ধীর, প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল। আহা! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি

আর জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোনার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল সুখের জগৎ কোথায়, সে হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন; কোমল শীতল হস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরার স্নেহপূর্ণ নয়ন যেন সহোদরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। আহা! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায় লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি ঈষৎ শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু চিন্তার আবাসস্থান!

রঘুনাথ নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিলেন, বলিলেন,—ভগবন্, অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ? আমি যেন উন্মত্ত না হই।

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল। রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে, তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন!

রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটী আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে

চাহিলেন; তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই তরুণ যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অন্য সুখ দূর হউক, লক্ষ্মী! তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দাও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না।

লক্ষ্মী শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে, যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে উথলিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভগিনীর ন্যায় এ জগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ন্যায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, পাঠক, ক্ষমা কর।

অনেকক্ষণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল। তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন,—ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমাকে দেখিতে

পাইলাম, আহা, আজ আমার কি পরম সুখ, দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল? ভাই, এই শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে,চল মন্দিরের ভিতর যাই, আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।

ভ্রাতাভগিনী মন্দির অভ্যন্তরে আসিলেন,লক্ষ্মী একটী স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন,মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্বকথা কহিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যু হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গোবৎস বা মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন, বা নির্জ্জনে বসিয়া চারণদিগের গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যূষে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ-প্রদেশে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, অবশেষে একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর অধীনে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির

সহিত রঘুনাথের যুদ্ধব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ত্রুটি করেন নাই,- কিন্তু প্রভু শিবজীর অযথা সন্দেহে অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন! এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখ কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অবারিত অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন; তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ হইল, কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের নাম করিলেন না, ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন,— মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতিকাল পরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না, কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরব-জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুখে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভাইকে সুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য

কত চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দির পার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভাইকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ের শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের ব্যথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা, সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করা, এই নারীর ধর্ম্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দিয়া ভ্রাতার মন শান্ত করিতে লাগিলেন,—বলিলেন,আমাদিগের জীবনই এইরূপ,সকল দিন সমান থাকে না। ভগবান যে সুখ দিন, তাহা আমরা ভোগ করি, যদি এক দিন দুঃখ পড়ে, তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানবজন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব, তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দ্দিন সকলেরই আছে, দুর্দ্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম করিয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন। ভাই, এ নৈরাশ দূর কর, এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কতদিন থাকিবে? আহার-নিদ্রাত্যাগ করিলে মনুষ্য জীবন কত দিন থাকে?

রঘুনাথ।—থাকিবার আবশ্যক কি? যেদিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?

লক্ষ্মী—তোমার ভগিনী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই, আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎসংসারে কেহ নাই। তুমি কি দুঃখিনীর প্রতি সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?

রঘুনাথ।—লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভালবাস তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট দিব সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনী! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই, তুমি স্ত্রীলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে? জীবন অপেক্ষা আমাদিগের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক অপযশও সহস্রগুণে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে!

লক্ষ্মী।—তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকট যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই বুঝিবেন।

রঘুনাথ উত্তর করিলেন,—না। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন, পিতার অভিমান, পিতার দর্প, পুত্রে বর্ত্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে এরূপ আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন,—মার্জ্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অসম্মত হও, কার্য্যদ্বারা কেন আপন যশঃ রক্ষা কর না? পিতা বলিতেন, "সেনার সাহস ও প্রভুভক্তি

কার্য্যে প্রকাশ হয়।” যদি বিদ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সন্দেহ খণ্ডন কর না?

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে?

লক্ষ্মী। শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানিব বল? কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহারই ন্যায় বীর প্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে?

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত তবে বুঝিতেন, কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-হৃদয়-শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞা নহেন। যে ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে শোকসন্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন ও মুখমণ্ডল সহসা নব গৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন লক্ষ্মী! তুমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় উৎসাহ-শূন্য নহে, ভগবান্ সহায় হউন, রঘুনাথ বিদ্রোহী নহে, ভীরু নহে, একথা এখনও প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এসমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন,—রোগ-নির্ণয় করিলাম আমি, ঔষধি দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না? প্রকাশ্যে বলিলেন,—ভাই! তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ

জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব? কিন্তু যাহাই হউক তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যতদিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণ মনোরথ হও জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবে।

রঘুনাথ।—আর লক্ষ্মী! আমি যতদিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখনও বিস্মৃত হইব না।

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—আমার আর একটী কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।

রঘুনাথ।—লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার কি কথা কহিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?

লক্ষ্মী।—চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করিয়াছেন।

রঘুনাথের হাস্য দূর হইল, মুখ রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু সে উদ্বেগ দমন করিয়া রঘুনাথ কহিলেন,—চন্দ্ররাও রাজার নিকট যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা অযথার্থ নহে। তিনি আমার অন্য কোন অপকার করিয়াছেন কি না তাহা আমি জানি না।

লক্ষ্মী। তিনি যাহাই করিয়া থাকেন, ভাই, অঙ্গীকার কর তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।

রঘুনাথ নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী পুনরায় বলিলেন,—ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটী কথা বলিলাম, ভাই আমাকে যদি ভালবাস এ কথাটী রাখিও।

সে অনুরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ভগিনীর হাত দুইটী ধরিয়া বলিলেন,—লক্ষ্মী, আমার মনে সন্দেহ হয়

চন্দ্ররাওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। কিন্তু তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। এই ঈশানী মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, চন্দ্ররাওয়ের কোন অনিষ্ট করিব না। আমি তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করিলাম, জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন,—জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।

পূর্ব্বদিকে প্রভাতের আলোচ্ছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সস্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় হইলেন, বলিলেন,—আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে, এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণে আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন,—এই বলিয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত।)

বিদ্যাসাগরচরিত্র।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাত-প্রবণ বাঙালী হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালীজন-সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহাতে বাঙালীদুর্ল্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল

একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্ব্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমাশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন্ কষ্টে ফেলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃত কলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন তাঁহার চাক্‌রি করিবার ইচ্ছা কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিন তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরের উপকারকার্য্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ্ প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ আমাদের দয়ার মধ্যে জিদ্ না থাকাতে তাহা সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ-কর্ম্ম-প্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভার লাঘব করা নহে; তাহা

দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোন ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস-শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছু মাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্য্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেকস্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সঙ্কট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুর-চারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতারক্ষার নিয়মলঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোন এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসৎকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয় পরিজনের অন্তরে চিরশোকশাল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগাল কুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পরোপকার পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ,—পুরুষোচিত; এইজন্য তাহা সরল এবং নির্ব্বিকার; তাহা

কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকা কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজু রেখায় নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখন রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, খর্ম্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্দ্ধমান বাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভূচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন—"অন্নচ্ছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুইপলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।"

এই ঘটনা-শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটী নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচ-জাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানব-ধর্ম্ম বশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণতঃ তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশী। অর্থাৎ কর্ত্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না।

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড় বড় গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত অতি সূক্ষ্ম, তর্কের বাহাদুরীতে ছোটে ভাল, কিন্তু কর্ম্মের পথে গাড়ী লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত, তবে যিনি একসময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অকুতোভয়ে চাক্‌রী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন-জীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে স্বচ্ছল স্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরিভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্ত্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায় সঙ্কল্পের ঋজুরেখা হইতে কোন মন্ত্রণায়, কোন প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্র-

পরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্য্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্ব্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রপলিটান্ বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন—ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষী ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি,—এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলা-ফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রের অদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্ম্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মত কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্ম্মবুদ্ধি বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল।

যেমন কর্ম্মবুদ্ধি, তেমনি ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে, তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।" ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের। তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত-উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্ম্মূল্য-দুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই;—তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি, তাহা

পালন করি না ; ভূরিপরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না ; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না। এই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন দাম্ভিক তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ব্ববিষয়ে ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন, সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য তিনি বর্ত্তমান নাই, -কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিস্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যা-সাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত দুর্গম-বিস্তীর্ণ-কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্যবীর্য্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমা-দের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা

নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

(শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ভারতের জ্যোতিষবিদ্যা ভারতবর্ষীয় কি না?

সংস্কৃত ভাষায় "তাজিক" ও "রোমকসিদ্ধান্ত" নামক দুই খানা জ্যোতিষবিদ্যার গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থদ্বয় বিদেশীয় ভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদিত। তাজিকের রচিয়তার নাম যবন, ইনি ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে গ্রীক জাতীয়। সংস্কৃত ভাষায় তাজিক ও রোমকসিদ্ধান্ত দেখিয়া ভারতের জ্যোতিঃশাস্ত্র ভারতের নিজস্ব কি না এতদ্বিষয়ে কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা গ্রীশ ও রোমরাজ্য হইতে ভারতে আনীত হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, জ্যোতিঃশাস্ত্র গ্রীশ ও রোমরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয় নাই, পরন্তু উহা ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে গ্রীশ ও রোমরাজ্যে নীত হইয়াছে এবং তৎপরে গ্রীশ ও রোম হইতে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য জগতে প্রচার লাভ করিয়াছে।

শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে অষ্টাদশ জন জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন। * সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ট, অত্রি, পরশর, কশ্যপ,

---

* কেলেব্রুক, বেণ্টলি প্রভৃতি।

† সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্টাত্রি পরাশরাঃ। কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচিমনুরাঙ্গিরাঃ॥
লোমশঃ পৌলিশাশ্চৈবচ্যবনো জবনো গুরুঃ। শৌনকাহষ্টদশাশ্চৈতেজ্যোতিঃশাস্ত্রঃ প্রবর্ত্তকাঃ॥

(বলভদ্র প্রণীত মদ্ধায়ণরত্ন দ্রষ্টব্য।)

নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিশ, চ্যবন, জবন, বৃহস্পতি এবং শৌনক,এই অষ্টাদশ ঋষি জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।

ইহাঁদিগের মধ্যে জবন ঋষির নাম দর্শনেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উক্তভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জবন ভারতবর্ষেরই একজন প্রাচীন ঋষি, কিন্তু তাঁহারা ইঁহাকে তাজিক প্রণেতা যবন বলিয়া মনে করিয়াছেন। বলভদ্রপ্রণীত মন্ধায়নরত্ন পুস্তকে দেখা যায় জ্যোতিঃ শাস্ত্র প্রবর্ত্তক জবনের নামে বর্গীয় জকার ব্যবহৃত। তাজিকপ্রণেতা যবনের নামে অন্তঃস্থ যকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সংস্কৃত তাজিক যবনকর্ত্তৃক পারশ্য ভাষায় লিখিত তাজিক গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থ সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রের পরে লিপিবদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে রোমকসিদ্ধান্ত গ্রন্থে স্পষ্ট উক্তি আছে। রোমকসিদ্ধান্ত বলেন *,—ব্রহ্মা সূর্য্যকে এবং সূর্য্য যবনকে যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহার নাম তাজিক। সুতরাং তাজিককার যবন ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ সূর্য্যের নিকট জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ব্রহ্মা প্রণীত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও সূর্য্যপ্রণীত সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাজিকের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। আর রোমকসিদ্ধান্তে তাজিকের বিবরণ থাকায় ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে,রোমকসিদ্ধান্ত গ্রন্থ তাজিকের পরবর্ত্তীকালে রচিত। সুতরাং তাজিক ও রোমকসিদ্ধান্ত উভয় গ্রন্থই আর্য্যজ্যোতিঃশাস্ত্রের পশ্চাদ্বর্ত্তী।

পারস্যভাষা হইতে তাজিক সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

---

* ব্রহ্মণাপাদিতং ভানোর্ভানুনা যবনায় যৎ।
যবনেন চ যৎপ্রোক্তম্ তাজিকং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।

গ্রীক জাতীয় যবন যে পারস্ত ভাষায় মূলগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। ইঁহার রচিত গ্রীক ভাষার মূলগ্রন্থের যে পারসী অনুবাদ হয়, সংস্কৃত তাজিক তাহারই ভাষান্তর। ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই গ্রন্থের ভারতে প্রবেশকাল আরও কত পশ্চাদ্বর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। পুস্তকের শাস্ত্রীয় পরিচয়ও এই মতের প্রতিকূল নহে। * সমরসিংহ প্রভৃতি পারসী তাজিক গ্রন্থ ব্রাহ্মণের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই সমরসিংহ কি মিবারের প্রসিদ্ধ সংগ্রামসিংহ নহেন ? যদি তিনিই হন, তবে ত তাজিকের ভারত প্রবেশকাল সে দিন বলিলেই হয়। এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে তাজিক ও রোমকসিদ্ধান্তের আধুনিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না।

অথচ ভারতের জ্যোতিষ কত প্রাচীন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন শাস্ত্রে নক্ষত্রচক্রে কৃত্তিকার নাম প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। নক্ষত্রচক্রে কৃত্তিকার নাম প্রথম সন্নিবেশিত হইল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে কৃত্তিকা বিষুবদ্‌বৃত্তে অবস্থান করিত। বিষুবদবৃত্তে অবস্থান করিত বলিয়াই কৃত্তিকা নক্ষত্রচক্রের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তিও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় *। এই উক্তি হইতে জানা যায় যে,তৎকালে কৃত্তিকা নক্ষত্র ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত

---

* যবনাচার্য্যেন পারস্তভাষায়া প্রণীতম্ জ্যোতিঃশাস্ত্রৈকদেশরূপং বার্ষিকাদি নানাবিধ ফলাদেশফলকং শাস্ত্রং তাজিকশব্দবাচ্যং তদনন্তরসম্ভূতৈঃ সমরসিংহাদিভিরধীতম্ ব্রাহ্মণৈ-স্তদেবশাস্ত্রং সংস্কৃতশব্দোপনিবদ্ধং তদপি তাজিক শব্দবাচ্যমেব।

হইত। বর্ত্তমানকালে অয়ন-চলন বশতঃ বিষুবন ক্রমশঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। এক্ষণে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে বিষুবন অবস্থিত। খ্রীষ্টাব্দের প্রায় দ্বাবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবদ্ দিন হইত। আর্য্যজ্যোতিষ কত প্রাচীন, একবার অনুধাবন কর। সংস্কৃত ভাষায় দুই একখানা বিদেশীয় জ্যোতিষগ্রন্থের প্রচার দেখিয়া বিদেশ হইতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ভারতে আনীত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভারতবর্ষ ঐ বিদেশীয় পুস্তকের সমাদর করিয়া স্বকীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহাই মাত্র অবগত হওয়া যায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের কাল নিরূপিত হয়, এই হেতু শাস্ত্রে জ্যোতিষ বেদাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। * ‡ জ্যোতিষ বেদের অঙ্গস্বরূপ,—অতএব ইহা নিশ্চয়ই বেদের তুল্য প্রাচীন। ফলতঃ ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা সহস্র বৎসর চিন্তার পর যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার অনেক তত্ত্ব ঋগ্‌বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এই যে, চন্দ্র নিজে দীপ্তিহীন হইয়াও সূর্য্যকিরণস্পর্শে জ্যোতির্ম্ময়, ঋগ্‌বেদে এ তত্ত্ব আছে ‡। পণ্ডিতগণের মত ঋগ্‌বেদই জগতের

---

* এতা হ বৈ প্রাচৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্ব্বানি হ বা অন্যানি নক্ষত্রানি প্রাচৈ দিশশ্চবন্তে। (শতপথ ব্রাহ্মণ ২ ১ ২।)

‡ বেদাস্তাবৎ যজ্ঞকর্ম্মপ্রবৃত্তা যজ্ঞ প্রোক্তাস্তে তু কালাশ্রয়েণ : শাস্ত্রাদস্মাৎ কালবোধো যজ্ঞঃস্যাৎ বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষমস্তোমস্মাৎ ॥ (গণিতাধ্যায়।)

‡ অত্রাহ গোরমান্ত তৃষ্টুর পীচ্যং। ইত্থা চন্দ্রমাসা গৃহে।

(১ মণ্ডল, ৮৪ সুক্ত, ১৫ ঋক্।)

রমেশ বাবুর অনুবাদে ইহার অর্থ—সূর্য্য হইতেই চন্দ্রের দীপ্তি হয়।

প্রাচীনতম গ্রন্থ। অতএব ভারতের জ্যোতিঃশাস্ত্রও জগতের আদিশাস্ত্রমধ্যে গণ্য। ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনত্বের অন্য প্রমাণ আর কি আবশ্যক হইতে পারে ?

অতএব বুঝা গেল যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার ভারতবর্ষেই উৎপত্তি। ভারতবর্ষীয় অন্য ঋষিগণই এই শাস্ত্রের উদ্ভাবক। গ্রীক্ জাতীয় যবন ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ সূর্য্যের নিকট জ্যোতিঃ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে গ্রীশ দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যা নীত হইয়াছে,এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

আরবী ভাষায় "তোয়ারিকল্ হোক্‌মা" নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উহা পাঠে জানা যায় যে, আরবের রাজা ওয়ালিদ ৭০৯ অব্দে স্পেনদেশ জয় করিয়া তথায় আরবী ভাষার প্রচার করিয়া-ছিলেন। তাহার পর ৭৬৩ অব্দে বোগদাদের রাজা অল্‌মানসুর গ্রীক্ ভাষার পুস্তক হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র আরবীতে ভাষান্তরিত করেন। পরে আরবী ভাষা হইতে এই শাস্ত্র ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া নানা প্রদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এইরূপে ভারতবর্ষ হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রথমতঃ গ্রীশ ও রোম-রাজ্যে, অনন্তর গ্রীশ ও রোম হইতে পাশ্চাত্য জগতে নীত ও বিস্তৃত হইয়াছে। হিন্দুজ্যোতিষ অতি প্রাচীন শাস্ত্র, --ইহা কদাচ ভারতের ধার করা বিদ্যা নহে।

শ্রীপরেশনাথ মহলানবীশ (সংক্ষিপ্ত।)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

পদ্যভাগ।

সতীর উপাখ্যান।

(১)

বিধির মানসসুত, দক্ষমুনি তপোযুত,
প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া,
তাঁর গর্ব্ভে সতী নাম, অশেষ মঙ্গল ধাম,
জনম লভিলা মহামায়া।
নারদ ঘটক হয়ে, নানা মত বলে কয়ে,
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী,
শিবের বিকট সাজ, দেখি দক্ষ ঋষিরাজ,
বামদেবে হৈলা বামমতি।
সদা শিব নিন্দা করে, মহাক্রোধ হৈল হরে,
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে,
দক্ষেরে বিধাতা বাম, না লয় শিবের নাম,
সদা নিন্দা করে কটুভাষে।

আরম্ভিয়া দেবযাগ, নিমন্ত্রিল দেবভাগ,
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে,
যাইতে দক্ষের বাস, সতীর হৈল আশ,
ভারত কহিছে যোড়করে।

(২)

"নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন,
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন।
শঙ্কর কহেন, "বটে বাপ ঘরে যাবে,
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া আপমান পাবে।
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম,
আমারে না দিবে ভাগ, এই তার কর্ম্ম !
সতী কন, "মহাপ্রভু, হেন না কহিবা,
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ?
যত কন সতী, শিব, না দেশ আদেশ,
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ;
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা,
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণ পূরা।
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে,
গলিত রুধির মুণ্ড বামকরতলে।
আর বামকরেতে কৃপাণ খরশাণ,
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান।

লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের তু'পাশে,
ত্রিনয়ন অৰ্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে !
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ ;
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ;
নীলবর্ণা, লোলজিহ্বা, করালবদনা,
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা !
অৰ্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল,
ত্রিনয়ন, লম্বোদর, পরা বাঘছাল !
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি, সমুণ্ড খর্পর,
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর
দেখে ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি,
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী !
রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না, ভালে সুধাকর,
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুর ধনুঃশর !
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ,
পঞ্চপ্রেত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ !
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা,
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা !
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ,
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারিভুজ !
ত্রিনয়না অৰ্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল,
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল !

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে,
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে !
রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, কমল-আসনা,
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ ভূষণা !
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর,
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর।
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত,
ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত !
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে,
তিনগুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে !
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে,
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে !
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার,
এক ধার নিজমুখে করেন আহার !
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী,
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী !
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন,
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন !
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন,
ধূমাবতী হ'য়ে সতী দিলা দরশন !
অতিবৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন,
কাকধ্বজ রথারূঢ়া ধূমের বরণ !

বিস্তারবদনা, কৃশা, ক্ষুধায় আকুলা,
এক হস্ত কম্পমান, আর হস্তে কুলা!
ধূমাবতী দেখে ভীম সভয় হইলা,
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা!
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা,
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা!
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি,
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া উর্দ্ধ করি!
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন,
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন!
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া,
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া!
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি,
চতুর্ভুজা খড়গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি!
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে,
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে!
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান,
মহালক্ষ্মী রূপে সতী হৈলা অধিষ্ঠান।
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ,
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ!
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে,
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে!

পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈল হর,
মহাভয়ে ভীত, কম্পমান্ কলেবর!
লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হৈলা সতী,
গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীর মূরতি!
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়,
"যে ইচ্ছা করহ," বলি দিলেন বিদায়!
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে,
রথে চড়ি' গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে।
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে,
শিবনিন্দা করিয়া সবার আগে বলে!
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে,
নিন্দাছলে স্তুতি করি, শঙ্কর বুঝিবে।

(৩)

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়,
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়!
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান,
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান।
যবনে ব্রাহ্মণে কুক্কুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম,

গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গরে নাহি যম।
সুখে দুঃখ জানে, দুঃখে সুখ মানে,
পরলোকে নাহি ভয়,
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে,
সদা কদাচার ময়।
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত,
ক্ষত্রিয় কখন, না হয় ঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত।
যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়,
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজ দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায়।
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
না করে অতিথি সেবা,
সতী ঝী আমার গৃহিণী তাহার,
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ?
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,
কৈলাস নামেতে ঘর,
ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,
একি মহাপাপ হর !

সতী ঝী আমার, বিদ্যুৎ আকার,
বাতুলের হৈল জায়া,
আমি অভাজন, পরম ভাজন,
ঘটক নারদ ভায়া !
আহা মরি সতী, কি দেখি দুর্গতি,
অন্ন বিনা হৈলা কালী,
তোমার কপাল, পর বাঘছাল,
আমার রহিল গালি !
শিবনিন্দা শুনি, রোষে যত মুনি,
দধীচি অগস্ত্য আদি,
দক্ষে গালি দিয়া, চলিল উঠিয়া,
শ্রবণে কর আচ্ছাদি' !
তবু পাপ দক্ষ, নিন্দি কত লক্ষ
সতী সম্বোধিয়া কহে,—
"তার মৃত্যু নাই, তোর নাহি ঠাঁই,
আমার মরণ নহে।
মোর কন্যা হয়ে, প্রেত সঙ্গে রয়ে,
ছিছি, একি দশা তোর,
আমি মহারাজ, তোর এই সাজ,
মাথা খেতে এলি মোর !
বিধবা যখন, হইবি তখন,
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব,

সে পাপ থাকিতে, নারিব রাখিতে,
তার মুখ না দেখিব।”
শিবনিন্দা শুনি, মহাদুঃখ গণি,
কহিতে লাগিলা সতী,—
“শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর,
কেন বাপা, হেন মতি ?
যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে,
কি কহিব তুমি বাপ,
তব অঙ্গজনু, ত্যজিব এ তনু,
তবে যাবে মোর পাপ !
তিনি মৃত্যুঞ্জয়, গালিতে কি হয়,
মোর যেতে আছে ঠাঁই,
কর্ম্ম মত ফল, যজ্ঞ যাবে তল,
তোর রক্ষা আর নাই।
যে মুখে পামর, নিন্দিলে শঙ্কর,
সে মুখ হবে ছাগল,
এতেক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া,
উত্তরিলা হিমাচল।
হিম গিরিপতি, ভাগ্যবান্ অতি,
মেনকা তাঁহার জায়া,
পূর্ব্ব তপোবরে, তাহার উদরে
জনমিলা মহামায়া।

সতী দেহ ত্যাগে, নন্দী মহারাগে,
সত্বরে গেল কৈলাসে,
শূন্যরথ লয়ে, শোকাকুল হ'য়ে,
নিবেদিল কৃত্তিবাসে !
শুনিয়া শঙ্কর, শোকেতে কাতর,
বিস্তর কৈলা রোদন,
লয়ে নিজগণ, করিলা গমন,
করিতে দক্ষদমন।

(৪)

ভূতনাথ ভূতসাত দক্ষযজ্ঞ নাশিছে !
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে !
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি,
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অস্ত্রচালি মাহুতি।
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া,
যাও যাও হুঁদি খাও দক্ষ দেয় হাঁকিয়া।
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্ব্বৃতি,
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি।
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া,
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া !
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোফ ছিঁড়িল,
ভূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল।

বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে,
ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে !
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে,
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে !
যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্যগব্য খাইছে,
ঊর্দ্ধ হাত বিশ্ব নাথ নাম গীত গাহিছে !
মার্ মার্ ঘের্ ঘার্ হান্ হান্ হাঁকিছে,
হুপ্ হাপ্ দুপ্ দাপ্ আশ্ পাশ্ ঝাঁপিছে !
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে,
হুম হাম খুম খাম ভীমশব্দ ভাষিছে !
ঊর্দ্ধ বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে,
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে !
অগ্নিজ্বালি সর্পিঃ ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে,
ভস্ম শেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে !
হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূতিছে,
পদঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তী পুতিছে !
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে,
হূল থুল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে !
মৌন তুণ্ড হেঁটমুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে,
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে !
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে !
ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে।

(৫)

এইরূপে যজ্ঞসহ দক্ষ নাশ পায়,
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায়।
বিধি বিষ্ণু দুইজন নিজ স্থানে ছিলা,
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা।
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর,
দক্ষবাসে শিবপাশে আইলা সত্বর।
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া,
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া!
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ,
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ!
দূরে গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়,
প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয়,—
"বিশ্বের জনক তুমি, বিশ্বমাতা সতী,
অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি?
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই,
সতী মোর কন্যা, তুমি আমার জামাই।
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়,
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়।
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ,
দক্ষের এ দোষ কেন, বেদের এ দোষ।

যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল,
যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল।
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি,
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী।
সতীর জননী আমি, শাশুড়ী তোমার ;
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার !
ছাড়িয়া গেলেন সতী, মরিলেন পতি ;
তোমার না হয় দয়া, কি হইবে গতি ?
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়,
আমারে কাহারে দিবা, কহ দয়াময় ?”
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইল,
রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল।
ধরে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়,
উঠে পড়ে ফিরে ঘূরে কবন্ধের প্রায়।
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ,
প্রসূতি বলিছে, “প্রভু, একি বিড়ম্বন ?
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা।
“শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব,
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব।
অপরাধ ক্ষমি তার যদি দিলা প্রাণ,
কৃপা করি মুণ্ড দেহ, কর জ্ঞানবান।”

শুনিয়া নন্দীরে শিব কহিলা হাসিয়া,—
"কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া।"
নন্দী বলে, "তব নিন্দা করিয়াছে পাপ,
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ।"
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়,
যে মত করিলা কর্ম্ম উপযুক্ত হয়।
শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া,
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেন আঁটিয়া।
মিলন হইল ভাল, হর দিলা বর,
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর।
"তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মা, তুমি হরি হর,
তুমি জল, তুমি বায়ু, তুমি চরাচর।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি মধ্য হও,
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও।
নিরাকার, নির্গুণ, নিঃসীম, নিরুপম,
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম।"
বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল,
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া
যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া।
যজ্ঞ স্থানে সতী দেহ দেখিয়া শঙ্কর,
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর।

শিবে লয়ে সতী দেহ করিলা গমন,
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ।
বিধিসঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর,
সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর।
যথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি,
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি।
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর,
মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির।
করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব,
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব!
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্যাসকাশী।

কাশীতে না পেয়ে বাস, মনোদুঃখে বেদব্যাস
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস,
তুচ্ছ লোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
আমার না হৈল কাশীবাস।
এ বড় দারুণ শোক, কলঙ্ক ঘুষিবে লোক,
ব্যাস হৈল কাশী হতে দূর,
নাম ডাক ছিল যত, সকল হইল হত,
ভাঙ্গর করিল দর্প চূর!

তেজোবধ হয় যার, প্রাণবধ ভাল তার,
কোনখানে সমাদর নাই,
সবে করে উপহাস, ইনি সেই বেদব্যাস,
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই।
যদি করি বিষ পান, তথাপি না যাবে প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই,
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিলা গোসাঞি।
ভবিতব্য ছিল যাহা, অদৃষ্টে করিল তাহা,
কি হবে ভাবিলে আর বসি,
তবে আমি বেদব্যাস, এই খানে পরকাশ,
করিব দ্বিতীয় বারাণসী।
করিয়াছি যত তপ, করিয়াছি যত জপ,
সকল করিনু ইথে পণ,
নিজ নাম জাগাইব, এই খানে প্রকাশিব,
কাশীর যে কিছু আয়োজন।
কাশীতে মরিলে জীব, রাম নাম দিয়া শিব,
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে,
এখানে মরিবে যেই, সদ্যমুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে।
অসাধ্য সাধন যত, তপস্যায় হয় কত,
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা,

বিধি রঙ্গে বিরোধিয়া, তপস্যায় ভরদিয়া,
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ?
মোরে দেখাইল শিব, তার সেবা না করিব,
বর না মাগিব তার ঠাঁই,
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ, নন্দী করেছিল খুন,
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই।
বিধাতা সবার বড়, তাহারে করিব দড়,
যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি,
তিনি পিতামহ হন, সন্তানে বিমুখ নন,
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি।
তাঁরে তুষি তপস্যায়, বর মাগি তাঁর পায়,
সকলে পাইব হেথা বসি,
পুরী করি মোক্ষ ধাম, জাগাইব নিজ নাম,
নাম থুব ব্যাস বারাণসী।

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন,
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন।
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া,
বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া,
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া,—

"ওরে বাছা ব্যাস, তুমি বড়ই ছাবাল,
শিব সঙ্গে বাদ কর, এ বড় জঞ্জাল !
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে,
তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হতে কিবা হবে ?
শিব নাম জপ কর যেথা সেথা বসি,
যেখানে শিবের নাম, সেই বারাণসী।
তুমি কি করিবে কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে ?
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে ?
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা ?
আমি যে বিধাতা, শিব আমারো বিধাতা !
আমার আছিল বাছা পাঁচটী বদন,
এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন।
কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর ?
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলা হয় যাঁর !
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে,
বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে !
ভালে যাঁর সুধাকর, গলায় গরল,
কপালে অনল যাঁর, শিরে গঙ্গাজল !
সম যাঁর সুধা বিষে, হুতাশন জল,
অন্যের যে অমঙ্গল, তাঁরে সে মঙ্গল।
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ, আমি ইথে নাই,
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঞি।"

এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজ স্থানে,
ব্যাসের ভাবনা হৈল, "কি হবে নিদানে!
যে হৌক সে হৌক, আরো করিব যতন,
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার,
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্বমায়া যাঁর।
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা,
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা।
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা,
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা।
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়,
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়।
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি,
তবে সে হইবে মোর ব্যাস বারাণসী।"
এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির,
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর।

৩

গজানন ষড়ানন, সঙ্গে করি পঞ্চানন,
কৈলাসেতে করেন ভোজন,
অন্নপূর্ণা ভগবতী, অন্ন দেন হৃষ্টমতি,
ভোজন করিছে ভূতগণ।

ছয় মুখ কার্ত্তিকের, গজমুখ গণেশের,
মহেশের নিজে মুখ পঞ্চ,
কত মুখ কত জন, বেতাল ভৈরবগণ,
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ,
লেগেছে সিদ্ধির লাগি, খেতে বড় অনুরাগী
বার মুখ তিন বাপ পুতে।
অন্নদার হস্ত দু'টি, অন্ন দেন গুটি গুটি,
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে।
অন্নদা বুঝিলা মনে, কৌতুক আমার সনে,
বুঝা যাবে কেবা কত খান,
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়, পাতে পাতে অপ্রমেয়,
পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ,
খাইবেক কেবা কত, সবে হৈল বুদ্ধি হত,
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও,
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি, কে রাখিবে করে বাসি,
খেতে হবে খাও খাও খাও।
এইরূপে অন্নপূর্ণা, খেলে রসে পরিপূর্ণা,
নারী ভাবে পতি পুত্র লয়ে,
ব্যাসের তপের গাছ, অন্নদার লয় পাছ,
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে।
ব্যাস জপে অনশনে, অন্নদা জানিলা মনে,
ব্যাসের তপের অনুবলে,

কপালে টনক নড়ে, হাত হতে হাতা পড়ে,
উছট লাগিয়া পদ টলে।
তুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্ম মন্দ করে,
অন্নদার উপজিল রোষ,
অনুগ্রহ গেল নাশ, নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস,
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ।
ভাবে বুঝি ক্রোধভর, জিজ্ঞাসা করিলা হর,—
"কেন দেবী, দেখি ভাবান্তর ?"
অন্নদা কহেন হরে, "ব্যাস মুনি তপ করে,
অনশন কৈল বহুতর।
তুমি ঠাঁই নাহি দিলে, কাশী হতে খেদাইলে,
তাহাতে হয়েছে অপমান,
করিতে দ্বিতীয় কাশী, হইয়াছে অভিলাষী,
সেই হেতু করে মোর ধ্যান !"
হাসিয়া কহেন হর,— "বুঝি তারে দিবে বর,
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও ;
আমি বৃদ্ধ তাই কই, জানি নাই তোমা বই,
এক মুটা অন্ন মেনে দিও।"
সক্রোধে কহেন শিবা,— "কৌতুক করহ কিবা,
কি হয় তাহার দেখ বসি ;
এত বড় তার সাধ, তোমা সনে করি বাদ,
করিবেক ব্যাস বারাণসী !

তবে যে কহিবে মোর, তপস্যা করিল ঘোর,
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে,
অসময় সুসময়, না বুঝিয়া দুরাশয়,
বিরক্ত করিল অত্যাচারে !
বলিরাজা ভগবানে, ত্রিপাদ ধরণী দানে,
অধোগতি পাইল যেমন,
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া, শাপ দিব বর দিয়া,
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন !
মহামায়া মায়া করি, জরতী শরীর ধরি,
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা,
অন্নপূর্ণা পদতলে, ভারত বিনয়ে বলে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥

৪

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী,
ডান করে ভাঙ্গা লড়ী, বাম কক্ষে ঝুড়ী
ঝাকড় মাকড় চুল, নাহি আদি সাঁদি !
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ।
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলি বিলি,
কোটি কোটি কানকোটারির কিলি কিলি ॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে,
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ।

ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে,
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে।
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ, পিঠে কুঁজ ভার,
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার!
শত গাটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান,
ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান।
ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ি 'আহা' 'উহু' কয়ে,
জানু ধরি বসিলা বিরস-মুখী হয়ে।
ভূমে ঠেকে থুঁথি হাঁটু কান ঢেকে যায়,
কুঁজ ভরে পিঠ ডাঁড়া, ভূমিতে লুটায়।
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল,
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল!
মৃদুস্বরে কথা কন, অন্তরে হাসিয়া,
"ওরে বাছা বেদব্যাস, কি কর বসিয়া,
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে,
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে।
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই,
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই।
কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে,
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে!
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই,
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই?

তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়,
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ?"
ব্যাস কন, "এই পুরী কাশী হৈতে বড়,
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়।
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি এথা বাস কর,
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর।"
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া,—
"মরণ ডাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া !
তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব,
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব।
ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত,
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত !
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণ নুড়ি,
বাতে করিয়াছে খোঁড়া, চলি গুড়িগুড়ি।
শিরঃ শূলে চক্ষু গেল, কুঁজা কৈল কুঁজে,
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে।
কানকোটারিতে মোর কান হৈল কালা,
কেটা মোরে বুড়ি বলে; এত বড় জ্বালা !"
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধ ভরে যান,
আরবার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান।
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের,
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের।

ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া,
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া।
"বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও,
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও।
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ,
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয়, এই বড় দোষ।
মনে পড়ে না রে বাছা, কি কথা কহিলে,
পুনঃ কহ কি হইবে এখানে মরিলে ?"
ব্যাসদেব কন, "বুড়ী, বুঝিতে নারিলে,
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে।"
বুড়ী বলে, "হায় বিধি করিলেক কালা,
কি বল বুঝিতে নারি, এত বড় জ্বালা !"
পুনশ্চ চলিল দেবী ছলে ক্রোধ করি,
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি।
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা,
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা।
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত,
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত।
দৈব দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ,
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ।
একে বুড়ী, আরো কালা, চক্ষে নাহি সুঝে,
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে।

ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কানের কুহরে,
"গর্দ্দভ হইবে বুড়ী, এখানে যে মরে।"
"বুঝিনু" "বুঝিনু" বলি করে ঢাকি কান
"তথাস্তু" বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।

৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (সংক্ষিপ্ত)

মেঘনাদবধ কাব্য।

অশোক বনে জানকী।

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে;
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে! যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্তমণি;
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে!
স্বনিছে পবন দূরে, রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে

মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! ব'সেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম প'ড়েছে
তরুমূলে; যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিনী,
উচ্চবীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!

সরমার প্রতি জানকী।

হায় সখি! আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দু'খানি, আশার সরসে
রাজীব, নয়ন-মণি? হে দারুণ বিধি!
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কতক্ষণে চক্ষু-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে,
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি! থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?

হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।”
উত্তরিলা প্রিয়ংবদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা)! “এ অভাগী, হায়! লো সুভগে!
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি! প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যেমন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুনলো সরমে!
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে?”
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
শর লক্ষ্য করি স্বর; বিষম আঘাতে,
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে।
কতক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি!—“ক্ষম দোষ মম
মৈথিলি! এ ক্লেশ আমি দিনু অকারণে,
হায়! জ্ঞানহীন আমি!” উত্তর করিলা
মৃদুস্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা;

"কি দোষ তোমার ? সখি ! শুন মন দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা জ্বলয়ে যেমতি !)
ছলিল, শুনেছ, তুমি শূর্পনখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি ! মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি। ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে।
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী।
সহসা শুনিনু সখি ! আর্ত্তনাদ দূরে,
"কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?
মরি আমি !" চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী।
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;
"যাও বীর ; বায়ু-গতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ; যাও ত্বরা করি
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !"
"কহিলা সৌমিত্রি ;—দেবি ! কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী

রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে, এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ? আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ ; 'মরি আমি ! এ বিপত্তিকালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ! কোথায় জানকী !
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি !
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;
সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি !
রে ভীরু ! রে বীর-কুল-গ্লানি ! যাব আমি,
দেখিব, করুণ-স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ; ক্রোধ-ভরে, আরক্তনয়নে,
বীর-মণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ ; মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
যাই আমি, গৃহ-মধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;

তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।

"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয় সখি! কহিব তা কি আর তোমারে!
বাড়িতে লাগিল বেলা, আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায় সখি! জানিতাম যদি
ফুল-রাশি-মাঝে দুষ্ট কালসর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?

লক্ষ্মণের চণ্ডীপূজা।

কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে ;—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি!
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন; উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজি মাঝে

শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল ;
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ রঘুমণি ?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী বিলাসী ;
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি ? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি, বিদিত জগতে !"
উত্তরিলা রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল ! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি।
যে পূজে মায়েরে সেথা, জয়ী সে জগতে !
আর কি কহিব আমি ? সাহসেতে যদি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব !"

"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী রক্ষঃকুলোত্তম,
এ দাস ;" কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদি হে
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে !
কে রোধিবে গতি মোর ?" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায় ! কিন্তু কি করি ? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে !"
প্রণমি রাঘব-পদে বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বর-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ; "কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি ! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ !" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি !
রাঘবের দাস আমি !" আশু অগ্রসরি

সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে উর্ম্মিলা-বিলাসী।
কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপেছে ললাটে
শশিকলা মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ; শাল বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী; "দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ দেহ রণ বিলম্ব না সহে!

ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব !”
যথা শুনি বজ্র নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে !
“বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর !” ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে ! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ আঁখি,
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি !
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে ! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে !
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে !
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্ম্মুহুঃ-! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু

প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে !
কাঁপিল কনক লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টংকার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে !
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে ! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি ;
থামিল তুমুল ঝড় ; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে !
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে
ছুটিল সৌরভ ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ সোপানশত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি,
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
সুরেন্দ্র, করিলা, স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল ; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্রকেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে,

যথাবিধি। "হে বরদে," কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে,
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি !" গরজিল দূরে
মেঘ ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা ! ঢুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে !
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন
সিংহাসনে মহামায়ে ! তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে !
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক ; হাসিলা সতী ; পলাইল তমঃ
দ্রুতে ; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি !
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া, "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি ! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।

ধরি দেব-অস্ত্র, বলি ! বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে !
সহসা, শাদ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে
নাশ তারে। মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি !" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখি-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রিদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল নিক্কণে !
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর শিরে
তরুরাজি ; সমীরণ বহিল সুস্বনে।
"শুভক্ষণে গর্ব্ভে তোরে, লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর !" – কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তিগানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে !
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই ! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি !"
নীরবিলা সরস্বতী ; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিত ও বিভীষণ।

সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূলহাতে, ধূমকেতু সম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে !
"এতক্ষণে—"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে ;—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলি-শম্ভূ-নিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসব বিজয়ী ?
নিজ গৃহ পথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃ-তুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমনভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ ;—"বৃথা এ সাধন,
ধীমান্ ! রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি,—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছা মরিবারে !

রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কেবা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে ;
যায় কি সে, কভু, পঙ্কিল সলিলে ;
শৈবল দলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্র ভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, একি মহারথি প্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি ?
দেব-দৈত্য নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃ শ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! দেখি

ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ নন্দন কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীট বাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান—আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিন বদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষ্যি রাবণ- আত্মজে ;—
“নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম্ম দোষে, হায়, মজাইলা
কনক লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপ পূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল সলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি ! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?
রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীর যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,

কহিলা বীরেন্দ্র বলী ;—"ধৰ্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধৰ্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এসকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"

প্রমীলার চিতারোহণ।

সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী।
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কন মৃণালভুজে ; বিবিধ-ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর ; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল নারীকুল কাঁদে হাহারবে।

হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ, ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন, যথা পতি বিরাজেন এবে !
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় রে লতা !
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন কঞ্চুকবিভা নয়ন ঝলসে !
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্ব্বহ হোতা মহামন্ত্র জপি ;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণ দীপ দীপে চারিদিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কড়া কড়কড়ে ;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী ;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—

হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!
উতরি সাগরতীরে রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী,
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালা-দলে,
কহিলা ;—"লো সহচরি, এতদিন আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েয়ে মোর"—হায়রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী ;—
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;-
পতি বিনা অবলার আর কি জগতে?

আর কি কহিব, সখি ? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।”
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিল আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসব-বিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি ! বামভাগে প্রমীলা রূপসী।
চিরসুখহাসিরাশি মধুর-অধরে !
উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !

মেঘনাদের শবদাহকালে রাবণের বিলাপ।

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;—
“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,

বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পূত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে, আজি এ কাল-আসনে।
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে !
সেবিনু শিবিরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে,কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে,
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
"কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?" সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে,রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত (সংক্ষিপ্ত)।

মহম্মদের ঋণপরিশোধ।

১

ধন্য গুণধাম, পুণ্য তব নাম,
হজরত মহম্মদ !
ধর্ম্ম বিতরণে, শুদ্ধ আচরণে,
জগতের প্রেমস্পদ !
পতিত হইয়া রোগ শয্যাতলে,
পরিবৃত রহি' প্রিয় শিষ্যদলে,
ধর্ম্মচিন্তা সার কর অনিবার,
মানবের সুসম্পদ !

২

অবসন্ন দেহ রোগ যন্ত্রণায়,
তবু মনে পূর্ণ বল !
ব্যাধির সন্তাপে হিয়া নাহি কাঁপে,
ঈশে মন অবিচল !
চরম সময় বুঝি সমাগত,
অশ্রুপাত করে তব শিষ্য যত,
তুমি ধীর হয়ে, ধর্ম্মকথা কয়ে,
দুর্ব্বলে দিতেছ বল !
হেন কালে এক প্রিয় সহচরে
কহিল ডাকিয়া, "ভাই,

যদি কারো কাছে ঋণ মোর আছে,
এখনি শুধিতে চাই।
ঋণ রেখে যেবা পরলোকে যায়,
কিছুতে অন্তরে শান্তি নাহি পায়,
যে যাহা পাইবে, কৃপা করি নিবে,
ঘোষ বার্ত্তা সর্ব্ব ঠাঁই।"

৪

দেশের সর্ব্বত্র রটিল এ কথা,
ঘোষে লোক ঘরে ঘরে।
কিন্তু তব কাছে কারো প্রাপ্য আছে
কেহ না স্বীকার করে।
কহে এক জন সেনা আসি তবে,
অশ্ব চালাইতে কোথা নাহি কবে,
করিলা দৈবাৎ তুমি কষাঘাত,
তাহার পৃষ্ঠের' পরে!

৫

সে আসি চাহিল কি ভীষণ শোধ,
কি কঠিন প্রাণে হায়!
সেই কশাদিয়া তেমনি করিয়া
তোমা প্রহারিতে চায়!
এ দারুণ কথা করিয়া শ্রবণ,
কিছু না টলিল তব দৃঢ় মন,

কোথা কশা বলি হয়ে কুতূহলী,
আনালে তা অচিরায়।

:৬

কাঁদিতে লাগিল সহচরগণ
ভাবিয়া তোমার দশা!
পায়ে পড়ি তার কহে কত বার
পীড়িতে মের না কশা!
প্রীতি জনে জনে আমা সবাকার,
কশাঘাত কর দশ দশ বার,
কিংবা যত ধন চাহে তব মন,
কহ, পূরাইব আশা।

শুনি সেনা কহে, "এ কেমন কথা,
এ কিরূপ অনুরোধ?
একে দোষ করে, দণ্ড নিবে পরে,
ইথে হবে ঋণশোধ?
ধনেতে আমার নাহি প্রয়োজন;
দয়া প্রকাশেও নাহিক মনন;
আছে তনু ক্ষীণ রাখি দাও ঋণ,
না হইল পরিশোধ।"

৮

এতেক মনের দৃঢ়তায় তার,
বাক্যে ন্যায়-অনুগত,
প্রীতি-সম্ভাষণে মধুর বচনে
তুষিলে তাহারে কত !
"কোড়া মারি ঋণে দাও অব্যাহতি,"
কহিলে বসিয়া উঠি কষ্টে অতি ;
উৎসাহ না ধরে তোমার অন্তরে,
তুমি ঋণশোধে রত !

৯

"অনাবৃত ছিল মোর পৃষ্ঠদেশ,"
কোড়া ধরি সেনা কয় ;
অমনি সুজন, গাত্র আবরণ
খুলি দিলে সমুদয়।
এত মহত্ত্ব কে উপেক্ষিতে পারে ?
ভেঙ্গে গেল বাঁধ, কে সে রোধে তারে ?
দেখি দেবভাব, পবিত্র স্বভাব,
আর কি সে স্থির রয় ?

১০

যথা সিন্ধু পানে ধায় ভীম টানে
মহানদ খরধারে,

হৃদয় ভেদিয়া তরঙ্গ তুলিয়া
ডুবাইয়া দেয় তারে,
তেমনি সহসা সেনা ভীম বলে
পড়িল ছুটিয়া তব পদতলে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পায়ে লুটাইয়া
ভাসাইল একেবারে !

১১

আজিও সে কথা হইলে স্মরণ
পাষাণ গলিয়া যায় !
আজিও সে নীতি মানবের প্রীতি
দিকে দিকে উছলায় !
শত্রুমিত্র সবে প্রণয়ের যোগ,
সশরীরে যেন স্বর্গসুখভোগ !
প্রলয় পবনে মহাভূকম্পনে
কিছুতে টলে না হায় !

বিবি খদিজা।

তব নামে হয় মাগো, পবিত্র রসনা,
পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে মোস্লেমের প্রাণ,
দূরে পলায়ন করে অধর্ম্মবাসনা,
অন্তরে ভক্তির স্রোত হয় বহমান !

নিগূঢ় ধর্ম্মের তত্ত্ব আয়ত্ত তোমার,
মহাধার্ম্মিকের মর্ম্ম তুমিই বুঝিলে !
সাগরেতে স্রোতঃস্বতী মিশে যে প্রকার,
মহাত্মার সনে তুমি সেরূপ মিশিলে !
মহম্মদ মহাধর্ম্ম করিলা প্রচার,
হইলা তাঁহার তুমি অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী।
শুশ্রূষা করিলে তাঁর কত না প্রকার,
সেবিলে ধার্ম্মিকে তুমি ধর্ম্মস্বরূপিণি !
তুমিই চিনিলে ধর্ম্ম সকলের আগে,
সকলের বড় তুমি ধর্ম্ম অনুরাগে !

সৈয়দ ও এস্‌হাক্।

পারস্যসীমান্ত দেশে ছিল বিরাজিত
জনপদ, "বাহরেন" নামে পরিচিত।
"এবনে সওয়া" নাম, দেশের ভূপতি,
অনুরক্ত ছিলা বড় মৃগয়ার প্রতি।
একদিন নরপতি মৃগয়ার তরে,
প্রবেশিলা আরবের কানন ভিতরে
শ্রমক্লান্ত হয়ে সেথা আকুল তৃষায়,
পানীয় সলিল নাহি পাইল কোথায়।

"সৈয়দ" নামেতে শেখ খোদাভক্ত অতি;
সেখানে স্বগণ সনে করিত বসতি।
সাদরে সে দিল ভূপে সুশীতল নীর,
পান করি ভূপতির শীতল শরীর।
দয়া ও সৌজন্যে তার রাজা তুষ্ট মন,
করিলেন রাজধানী প্রতি-আগমন।
কিছুকাল পরে তার, সেই সে রাজায় আর,
বাঁধিল আরবগণে, রণ,
বহু আরবের সনে, সৈয়দেরে সেই রণে,
বন্দী কৈল রাজসৈন্যগণ।
রাজার আদেশ মত, বন্দীরা হইবে হত,
প্রত্যেক দশম জন করে'.
ভাগ্যদোষে গণনায়, সৈয়দ হইল তায়
একজন দশম ভিতরে!
যখন জল্লাদ তার, শিরচ্ছেদ করিবার,
বধ্যভূমে কৈল আয়োজন,
সহসা নৃপতি তারে পারিলেন চিনিবারে,
জলদাতা এই সে সুজন!
তখনি সম্বোধি তায়, কহিলা সে নররায়,—
"না পারিব দিতে শুধু প্রাণ,
প্রাণ ছাড়া কি তোমার, প্রার্থনীয়, আছে আর,
বল, আমি করিব প্রদান।"

সৈয়দ কহিল ভাষ,—"নাহি মোর অন্য আশ,
যদি আজ্ঞা দাও দয়া করে',
গৃহে আছে পুত্রধন, দেখিতে চাহিছে মন,
দেখে আসি দিনেকের তরে !"
রাজা কন,—"তবে দেহ এমন প্রতিভূ কেহ,
না হইতে দিবা অবসান,
যদি নাহি আস তুমি, সে আসিয়া বধ্যভূমি
তোমার বদলে দিবে প্রাণ।"
"এস্‌হাক্‌" নামে এক, ছিল সত্যনিষ্ঠ শেখ,
সৈয়দের ভাগীনেয় হয়,
অযাচিত রূপে আসি, প্রতিভূ সে হল হাসি',
সৈয়দ গেলেন নিজালয়।
হয়ে এল দিবা অবসান,
আকাশ সোনালী আভা ধরে,
তবু নাই সৈয়দের দেখা
বধ্যভূমে, প্রাণদণ্ড তরে !
সৈয়দ আসিবে পুনরায়,
এ বিশ্বাস ছিল না রাজার,
মৃত্যুমুখ এড়ায়ে কৌশলে,
ইচ্ছায় কে প্রবেশে আবার ?
বধ্যভূমে নীত এস্‌হাক্‌,—
ঘাতকের উন্মুক্ত কৃপাণ

তাহার রুধির পান লাগি
ঝক্‌ঝকি করিল উত্থান !
এমন সময় অকস্মাৎ
সৈয়দ আসিল বেগে ছুটি,
এস্‌হাকে ধরিয়া হৃদয়ে,
আলিঙ্গনবদ্ধ রৈল দুটি !
তার পরে কহিল সৈয়দ,—
"দয়াময় খোদার কৃপায়
আসিলাম বাছা এ সময়,
দেখিলাম জীবিত তোমায় !
এখন পারিব অনায়াসে
জীবন করিতে পরিহার,
বড় ব্যস্ত ছিলাম বাছনি,
এতক্ষণ চিন্তায় তোমার !"
নিরখিয়া নিরুপম হেন দেবভাব,
বিগলিত হয়ে গেল রাজার স্বভাব !
একটি কথায় করি বিশ্বাস স্থাপন,
প্রস্তুত আপন প্রাণ দিতে একজন ;
আর জন নিজ সত্য পালিবার তরে,
মৃত্যুর কবলে ছুটে আসে অকাতরে ;
এমন হইতে পারে, হয়েছে কখন,
দেখেনি সে নরপতি, করেনি শ্রবণ।

স্বচক্ষে নেহারি আজ গলিল হৃদয়,
ভাবভরে দু'নয়ন হল অশ্রুময়।
কহিলেন দুই জনে সম্বোধন করি,—
"কি দৃশ্য দেখালে আজ, আহা মরি মরি!
পরার্থপরতা আর প্রতিজ্ঞাপালন,
কোথায় এ মহাশিক্ষা করেছ গ্রহণ?
করিলাম মুক্তিদান, চিরজীবী হও,
তোমাদের ধর্ম্মে মোরে দীক্ষা দিয়া লও।
আজ হ'তে বন্ধু বলি করহ গণন,
প্রীতিভরে আসি মোরে দেহ আলিঙ্গন!"